কাজল রানা

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
অক্ষয় তৃতীয়া ১৭ বৈশাখ ১৩৭১

প্রকাশক :
বিজয়কৃষ্ণ দাস
অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬, কলেজ রো
কলকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রক :
শুভাশীষ মজুমদার
চয়নিকা
৪৭ কেশব সেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০০৯

KAJAL RANA

A Bengali Novel

এক মুঠো বালি নিয়ে আকাশে উড়িয়ে দিল কাজল। নিমেষে উড়ে গেল বালি। আর তারই ছু এক কণা রানার চোখে ঢুকে ওর চোখটা অন্ধকার করে দিল। কাজল সেটা লক্ষ্য করল না। কোনো দিকে খেয়াল নেই তার। হাতে আর এক মুঠো বালি নিয়ে আপন মনে সে হাঁটতে লাগল।

রানা যখন চোখ খুলে চাইতে পারল তখন কাজল অনেকটা এগিয়ে গেছে। রানা ওর দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু ভাবল। তারপর একছুটে পৌঁছে গেল কাজলের কাছে।

কাজল ছু পায়ে বালি ওড়াতে ওড়াতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। শেষ বিকেল। সমুদ্রের তীরে স্বাস্থ্যান্বেষীদের ভিড়। অনেকে জলে পা ভিজিয়ে এগোচ্ছে।

রানা পেছন থেকে এসে কাজলের একটা হাত চেপে ধরল। 'এই তুমি এমন করে বালি ওড়াচ্ছ কেন? জানো না চোখে বালি গেলে জ্বালা করে!' গলার স্বরে যেন একটু রাগ।

কাজল হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল না। খুঁটিয়ে রানাকে দেখল। চোখের ওপর চোখ রেখে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'ইস! এইতেই এই! ঝড়ে পড়লে কি করবে? তুমি বুঝি এখানে নতুন এসেছ? সমুদ্রে চান কর না? নোনা জলেও তো চোখ জ্বালা করে।'

'সে অন্য রকম', রানা বলল, 'তাতে এমন করকর করে না।'

কাজল ওর কথা বলার ভঙ্গিতে না হেসে পারল না। তবু হাসিটা কোনমতে চেপে বলল, 'কি হাতটা এখন ছাড়বে? না, আর এক মুঠো বালি তোমার চোখে ছুঁড়ে দেব?'

কি ভেবে রানা ওর হাতটা ছেড়ে দিল। তারপর বেশ গম্ভীর

হয়েই বলল, 'তুমি তো দেখছি আচ্ছা ঝগড়াটে মেয়ে! আমায় ভয় দেখাচ্ছ? কোথায় বাড়ি তোমার?'

কাজল যেন মজা পেল। 'আমি এখানকারই মেয়ে। সবাই আমাকে চেনে। থাকি মান ভবনে। তুমি? তুমি কোথায় থাক?'

'মান ভবন!' রানা অবাক। 'সে তো আমাদের বাড়ির লাগোয়া। পাশের বাড়িটাই। কই, আমরা তো তিনদিন হল এসেছি, তোমাকে তো একবারও দেখি নি?'

এবার কাজলের অবাক হওয়ার পালা।

'ও মা! তোমরাই বুঝি ওই বড় বাড়িটায় নতুন ভাড়া এসেছ?'

'ভাড়া আসব কেন? রানার যেন মানে লাগল, 'ওটা আমাদের নিজেদের বাড়ি।'

'তুমি ও বাড়ির ছেলে! যাঃ!' কাজল অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে চোখ বড় করে তাকায়।

'কেন তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?' কাজল বলল, 'ও বাড়ির দরোয়ানজি যে বলল, বাড়ির মালিকের কোনো ছেলে নেই।'

'দরোয়ানজি ঠিকই বলেছে', রানা বলল, 'ও বাড়িটা আমার জেঠুর। জেঠুর কোনো ছেলেমেয়ে নেই। তাই জেঠুর আর বড়মার যা কিছু তা সবই আমার।'

'গ্রামোফোনটাও!' কাজল ভীষণ একটা কৌতূহল নিয়ে রানার দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ।'

'কাল যেটা বাজছিল?'

'হ্যাঁ, সেটার কথাই বলছি।'

'আমায় একদিন দেখাবে?'

বালি ছোঁড়ার জন্যে কাজলকে দুকথা শোনাবার ইচ্ছে ছিল রানার। কাজলের কথায় নরম হয়ে পড়ল। ভুলে গেল একটু আগের ঝগড়ার কথা। রানা সামনের সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখল।

সেখানে তখন ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠছে, আবার পড়ছে। সূর্যের শেষ আলো সেই ঢেউয়ের মাথায় সোনার মতো ভেসে রয়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'বল আর কোনো দিন ঝগড়া করবে না। কারো চোখে বালি ছুঁড়বে না? বল, তাহলে তোমাকে শোনাব।'

'না না না, কক্ষনো না, কোনো দিন না।' কাজল প্রতিজ্ঞা করে বসল। গ্রামোফোন দেখবার লোভ তার খুব।

'মনে থাকবে ঠিক?'

'হ্যাঁ।' কাজল মাথা একপাশে হেলাল। তার মুখে সুন্দর একটু হাসিও ফুটে উঠল। 'আমি কোনো জিনিসে হাতও দেব না।'

রানার এবার আর তেমন ঝগড়াটে মেয়ে মনে হল না কাজলকে। বরং কাজলের সরলতা বেশ ভাল লাগল।

একটু ঘনিষ্ঠ সুরে রানা বলল, 'কই, তোমার নাম বললে না?'

'কাজল।'

'তোমার সঙ্গে ভাব হয়ে খুব ভাল লাগল। বেশ মজা হল আজ। ঝগড়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের কেমন আলাপ হয়ে গেল।'

'আমি ইচ্ছে করে তোমার চোখে বালি ছুঁড়ি নি। পিছনে ছিলে তাই দেখতে পাই নি। এখন আর রাগ নেই তো?'

'না।' রানা হাসল। এবার তার হাসিটাও মিষ্টি।

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে চারপাশ। সমুদ্রের ঢেউগুলোকে এক একটা কালো পাহাড় মনে হচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে রানা হঠাৎ বলল, 'চল এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

'আর একটু থাক না।' কাজল বলল, 'এই তো সবে সন্ধে হল।'

'না, আর নয়। নতুন এসেছি তো। তাড়াতাড়ি বাড়ি না ফিরলে বড়মা ভীষণ ভাববে।'

'ওরে বাব্বাঃ!' কাজলের হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল। 'ইস্! আজ আমার কপালে মার আছে। ভুলেই গেছি, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। চল যাই।'

দুজনে পা চালিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

যেতে যেতেই কাজল বলল, 'তুমি কাল খুব ভোরে উঠ। আমি যখন এখানে আসব তোমাকে ডেকে আনব। কেমন?'

'কি বলে আমায় ডাকবে? তুমি কি আমার নাম জানো?'

'ইস্ আমি কি বোকা।' কাজল রানার দিকে তাকাল। 'এতক্ষণে তোমার নাম জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি। কি নাম তোমার?'

'রানা। ভাল নাম রণজিৎ।'

কাজলের মা সুধামুখী।

নাম সুধামুখী হলেও তার মুখে আজ আর সুধা নেই। নতুন বউ হয়ে সে যখন মান ভবনে পা দিয়েছিল তখন হয়তো তার ভেতরে কিছুটা অমৃত ছিল। কিন্তু আজ সব শেষ। সংসারের নানা দাবি আর প্রত্যাশার কাছে সুধামুখী নিজের নামকে সার্থক করে তুলতে পারে নি।

সুধামুখীর বিয়ের সময় কাজলের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ। মা হারা কাজল প্রথম দিনই অবাক হয়ে দু হাতে সুধামুখীর গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'তুমি আমার নতুন মা।'

সুধামুখীর চোখে জল এসেছিল। সস্নেহে ওকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আদর করতে করতে বলেছিল, 'না, আমি তোমার মা। নতুন মা বলতে নেই সোনা।'

অন্য এক অচেনা জায়গায় আনকোরা বিয়ের সাজ পরা সুধামুখী সেদিন তার এই কথাটুকুর কি যে মানে হতে পারে তা নিশ্চয়ই বুঝে উঠতে পারে নি। পেটে না ধরে এই মা হওয়ার কত জ্বালা তা বোধ হয় কারো পক্ষেই আগে থেকে বোঝা সম্ভব নয়। বুঝতে শুরু করল সে দু চার দিনের মধ্যেই। এই বোধ আগে থেকে মানুষের

মনে থাকে না। কেমন করে আর কি ভাবে যে এসে পড়ে তা এক রহস্য।

বাড়িতে কাজলের মা'র ছবি ছিল। ছোট কাজলকে কোলে নিয়ে ওর মা স্বামীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে। এই ছবিটার দিকে প্রথমেই চোখ পড়ল সুধামুখীর। শরীরে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়তে লাগল জ্বালা।

একটা সুখের স্মৃতি, একটা পরিপাটি সম্পূর্ণ চেহারা সুধামুখী যেন সহ্য করতে পারল না। ফলে দিনের পর দিন জ্বালাটা বেড়ে চলল। আট বছরের পুরনো সেই জ্বালায় আজও প্রলেপ পড়ে নি।

পাড়ার সকলেই কাজলকে ভালবাসে। মা মরা এই মেয়েটা যেন সকলের মন কেড়ে নিয়েছে। সবার মুখে ওর কথা। ওকে নিয়ে গল্প। সেই সঙ্গে ওর মা'র কথাও।

সুধামুখীর কাছে সবচেয়ে অসহ্য হয়ে উঠেছে এইটেই। কবে মরে গেছে অথচ প্রতিবেশীদের মুখে তার আলোচনা। সেই সঙ্গে নানা মন্তব্য। এক একটা মন্তব্য যেন সুধামুখীর বুকে তীরের মতো বিঁধেছে।

সকলের মুখে এক-কথা, কাজল নাকি হুবহু ওর মায়ের মতো। সেই চোখ সেই মুখ সবই যেন বসানো। তেমনি গায়ের রঙ। অবিকল মা'র চেহারা পেয়েছে কাজল। কোনো তফাত নেই। এমনও তো হতে পারত কাজল তার বাবার আদল পেয়েছে। কিন্তু বাবার কোনো কিছুই কাজল পায় নি। যা কিছু সবই মায়ের প্রতিচ্ছবি। বরং মা'র ওপরে এক হাত টেক্কা দিয়েছে সে। কাজলের মা'র মাথায় চুল ছিল পাতলা। আর কাজলের ঠিক তার উল্টো। এও এক আশ্চর্য। কোথা থেকে সে পেল একরাশ কোঁকড়ান ঘন চুল। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন ওর রূপ ঠিকরে পড়ছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে যেন ভরাট হয়ে উঠছে ক্রমশ। একটা কুঁড়ি যেন আলোয় পাপড়ি মেলছে একটু একটু করে।

কাজলের এখন বয়স সবে চোদ্দ। অথচ ওর শরীরকে এখনই আর বাঁধনের মধ্যে ধরে রাখা যাচ্ছে না। কেউ বিশ্বাসই করবে না ওর বয়েস। লোকে কিছু বলবে এই ভয়ে সুধামুখী ওকে শাড়ি ধরিয়েছে। এ নিয়ে কাজলের কোনো ভাবনা নেই। শরীর বাড়লেও মন তার একই আছে। মা পরিয়েছে তাই বাধ্য হয়ে সে শাড়ি পরে। আসলে কিন্তু তার কাছে এ এক ভার। কোনো রকমে শাড়ি টেনে টেনে সে ঘুরে বেড়ায়। নেহাত মা'র ভয়ে কাজল শাড়ি বয়ে বেড়াচ্ছে। না হলে কবে ছুঁড়ে ফেলে দিত।

অনেক সময়ই একান্ত মুহূর্তে সুধামুখীর ইচ্ছে যায় কাজলকে আদর করতে, কাছে বসাতে। সরল আতুরে ওর মুখটার দিকে তাকালে আপনা থেকেই স্নেহ আর মমতা এসে পড়ে। সেই সময় ওকে দেখলে মনে হয় ও বোধ হয় বিশ্ব-সংসারের আদর কাড়বার জন্যই জন্মেছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জেগে ওঠে সেই জ্বালাটা।

সুধামুখী বহু চেষ্টা করেছে। মন থেকে জ্বালাটা মুছে ফেলতে। কিন্তু তা হয় না। জ্বালার সঙ্গে একটা হিংসে। হিংসেয় কালো হয়ে ওঠে সুধামুখীর মুখ। আদর করবার বাসনাটা চাপা পড়ে যায় মনের তলায়। কিছুতেই সুধামুখী কাজলকে নিজের করে নিতে পারে না। কে যেন বারবার তাকে মনে করিয়ে দেয় কাজল তার আপন মেয়ে নয়—বরং সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী, সতীন কাঁটা।

দেখতে দেখতে বিয়ের পর আট বছর কেটে গেছে। সুধামুখীর নিজের তিনটি সন্তান হয়েছে এর ভেতর। যদিও সব কটি বেঁচে নেই—দুটি সন্তানই মারা গেছে জন্মের পরে পরেই, একমাত্র বেঁচে আছে টুটুল। সবে দু বছর বয়স।

ভাইকে খুব ভালবাসে কাজল। এই কিছুদিন আগেও সে ভাইকে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াত সমুদ্রের ধারে। তখন ভাই ছাড়া একা তাকে ভাবাই যেত না। কিন্তু এখন আর যায় না। যায় না—না বলে

বলা উচিত সুধামুখী টুটুলকে আর ওর কাছে দেয় না। আগে কাজল রোজ বকুনি খেত ভাইকে নিয়ে দেরী করার জন্য। তবু তার মনে এই বকুনি দাগ কাটত না—টুটুলকে নিয়ে যাওয়ায় বাধা ছিল না। এখন সুধামুখী বিশ্বাস করতে পারে না কাজলকে—কাজলের টুটুলকে নিয়ে বাইরে বেরনো বন্ধ হয়ে গেছে। মনে মনে আহত হলেও কাজলের মুখ বুজে থাকা ছাড়া উপায় নেই। টুটুলকে কেন্দ্র করে মা মেয়ের সম্পর্ক যেন আরো সরে গেছে। ক্রমশ সরে যাচ্ছে।

মান ভবনের ছাদে দাঁড়ালে আদিগন্ত সমুদ্র তার নীল রঙ নিয়ে চোখের সামনে স্পষ্ট চেহারায় ভেসে ওঠে। বিকেল হলে সুধামুখী নিজেই টুটুলকে কোলে করে ছাদে যায়। সেখানে বসে থাকে সন্ধ্যো পর্যন্ত। দেখে সূর্যাস্ত। তারপর এক সময় যখন অন্ধকার মুছে নেয় সমুদ্রকে—আকাশে তারা ফোটে, সুধামুখী ছেলে নিয়ে নিচে নেমে আসে।

কাজল প্রায়ই বিকেল হওয়ার আগে বায়না ধরে ভাইকে নিয়ে যাবার জন্যে। বলে, 'দাও না মা, ভাইকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। কতদিন ও যায় না, তুমি দেখ আমি দেরী করব না ; ওকে কোল থেকে নামাব না। একবারটি শুধু ঘুরিয়ে নিয়ে আসব।'

'দিদির সঙ্গে যাব—দিদি—' আধো আধো কথায় টুটুল ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় কাজলের কোলে। কিন্তু সুধামুখী ছাড়ে না। ছেলেকে ধমকে বলে, 'না, তুমি যাবে না।'

তবু কাজল কাকুতি মিনতি করে। কান্নামেশানো গলায় ফের বলে, 'একবারটি দাও না, তোমার কোনো ভয় নেই—'

'না,' সুধামুখী ওকে ধমকে ওঠে, 'তোমায় নিতে হবে না, নিজের দিকেই হুঁশ নেই তারপর আবার এই একরত্তি ছেলে। যাও, ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে আমাকে শান্তি দাও।'

চোখভরা জল নিয়ে কাজল চলে যায় ভাইয়ের সামনে থেকে। টুটুল হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে শুরু করে। সুধামুখীর মাথায় আগুন

জ্বলে ওঠে। নিজের মনে গজগজ করতে করতে ছেলে ঠাণ্ডা করবার জন্য টুটুলকে নিয়ে ছাতে চলে যায়।

প্রত্যেক দিন কাজল মার খায় সুধামুখীর কাছে। এটা তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। মার খেয়েও কোনো হুঁশ নেই ওর। একই কারণে সুধামুখী ওকে ধরে বেঁধে ঠেঙায়। সেই সঙ্গে চিৎকার করে, 'কি সব্বনেশে মেয়ে রে বাবা! আবার আজ চুল ভিজিয়ে এসেছিস, নিত্যি বারণ করি তবু কথা কানে তোলে না। লোকে আমায় দুষবে একটা কিছু হলে, আর উনি ধিঙিপনা করে বেড়াবেন। আজ দেখাচ্ছি তোর মজা।'

সুধামুখী যতই চেঁচাক যতই মারুক কাজল নির্বিকার। ওই মারটুকু খাওয়ার সময় যা একটু উঃ আঃ তারপরই ভুলে যায় সবকিছু। মার খেতে খেতে রোজ ভাবে, না, কাল নিশ্চয়ই মা'র কথা শুনব। কিন্তু পরের দিন আবার বেমালুম ভুলে যায়।

সকাল হলেই কি যেন হয়ে যায়। সকাল থেকে সমুদ্র ওকে ডাকতে থাকে হাতছানি দিয়ে। সমুদ্রের কাছে গেলে সে ভুলে যায় সব কিছু। সব বোধ হারিয়ে যায় তার জ্ঞান থেকে। নেমে পড়ে অগাধ নীল জলে। আপন মনে দাপাদাপি করে। জামা-কাপড় ভেজায়, চুল ভেজায়, মাথায় একরাশ বালি ভরিয়ে বাড়ি ফেরে আর সুধামুখীর মার খায়।

মারবার পর সুধামুখীরও বুকের ভেতর কেমন অস্বস্তি হতে থাকে। একটা অসহ্য কষ্ট। ওর কান্না ভেজা মুখটা ভাসতে থাকে। কোনো কাজে মন দিতে পারে না সুধামুখী।

ছাদে ছেলেকে নিয়ে বসে সুধামুখী সেই কথা ভাবতে থাকে। কেন কাজল এমন করে? কেন সে তার কথা শোনে না? কেন কেন! সে ওর নিজের মা নয় বলে কি—না, কাজলের স্বভাবের মধ্যেই একটা অবাধ্যপনা রয়েছে। এক কথা রোজ না শুনলে তাকে অবাধ্যতা ছাড়া আর কি বলবে সুধামুখী। যত বয়স বাড়ছে

ততই কাজলের অবাধ্যতা বেড়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে দস্যিপনা। ওই সমুদ্র যেন ক্রমাগত ওকে আরো বেশি টানছে। সুধামুখীর ভয় হয় কোনো দিন না ওই সমুদ্রে কাজলের একটা কিছু হয়ে যায়।

ওকে দেখে কে বলবে ও মেয়ে!

ভয় নেই ডর নেই রাত করে বাড়ি ফিরবে। এক জ্বালা তো নয় ওকে নিয়ে। সমুদ্র তো আছেই। তাছাড়া আরো অনেক কিছু রয়েছে। কবে কখন কার পাঁচিলে কার গাছে উঠে বসে থাকবে— কার বাড়ির ছেলেমেয়েকে মারবে। সুধামুখী এ আর সহ্য করতে পারে না। সতীনের মেয়ের জন্য কোন্ মারই বা নালিশ শুনতে ভাল লাগে। এ মেয়ের জন্য একটা কেলেঙ্কারী তার কপালে জুটবেই!

যখনই ভাবতে ভাবতে সুধামুখী এইখানে এসে পড়ে তখনই আর অস্বস্তিটুকু থাকে না। মনটা আরো শক্ত হয়ে ওঠে। আরো নির্দয়! হিংসাটা ছোবল মারতে চায়।

পাড়া প্রতিবেশী নানা জনে নানা কথা বলে। নানা রকম জ্ঞান দেয়। কেউ কাজলের পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। কেউ কথার মধ্যে সুধামুখীর ত্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়। কেউ তার ভালমানুষীর নিন্দা করে। নানা জনের নানা কথা সুধামুখীকে হতভম্ব করে দেয়। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা খারাপ, কোন্‌টা উচিত কোন্‌টা অনুচিত সব গোলমাল হয়ে যায়। সুধামুখী বুঝতে পারে না। সে কি করবে। ফলে কাজলের ওপর একটা আক্রোশ বাড়তে থাকে।

এই সেদিন কি কথায় পুনির মা হঠাৎ বলল, 'বলি বউমা, মেয়েটার কি কোনো খোঁজ-খবর রাখ?'

'কেন কি হয়েছে মাসিমা?' সুধামুখী জিজ্ঞেস করল।

'এখনো হয় নি কিছু, তবে এবার একদিন হবে।'

কথার ঢঙে সুধামুখীর সারা শরীর জ্বলে ওঠে। তবু মুখে রাগ

দেখাতে পারে না। একটু শ্লেষ মিশিয়ে উত্তর দিল, 'কি আর খোঁজ রাখব বলুন, ও কি আমার কথা শোনে।'

'তা বললে তো চলে না বউমা,' পুনির মা ইচ্ছে করেই যেন শ্লেষটুকু ঘুরিয়ে দিল, 'একটা কিছু হয়ে গেলে তো লোকে তোমাকেই দুষবে।'

'বলতে আর মারতে বাকি রাখি নি মাসিমা, তাও রাতদিন সেই সমুদ্রে পড়ে থাকবে। আগানে বাগানে ঘুরবে, ও আমার মাথা খারাপ করে দিল, কি যে করি ওকে নিয়ে।'

'শুনছি কাজল নাকি আজকাল সমুদ্রে নুলিয়াদেরও হার মানায়।' পুনির মা বলতে লাগল, 'সকলে বলাবলি করে তাই তোমার কানে কথাটা তুলছি, ওকে ঘরমুখো না করতে পারলে শেষ পর্যন্ত একদিন দেখবে মেয়েটা জলেই প্রাণ দিয়েছে।'

'ওর বাবাকে বলুন।' সুধামুখীর কথায় ঝাঁজ। 'মেয়ের নামে কিছু বললে আমার কথায় সে কানই দেয় না। ভাবে, সতীনের মেয়ে তাই বানিয়ে বলছি ; তবু আপনাদের কথায় যদি বিশ্বাস করে।'

'তবু তোমার যতটুকু সাধ্য একটু সাবধান কবো বউমা। দেখতে দেখতে মেয়েটার বয়স বাড়ছে।' কথা শেষ করে পুনির মা চলে যাবার জন্য পা বাড়াল।

'বাপের আদরেই মেয়ের এই হাল, আমি কি করব।' সুধামুখী কথাটা পুনির মা'র দিকে ছুঁড়ে দেয়।

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চোখের সামনে সমুদ্রের চেহারা আর নেই। হাওয়ার শব্দটা আছে। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের মাথায় জ্বলে ওঠা ফসফরাসের চমক। সুধামুখী তখনো ছাদে বসে। কাজলের কথাই ভাবছিল সে। যত ভাবছে তত একটা রাগ তার বুকের ভেতর জমা হচ্ছে।

অন্ধকার হয়ে গেছে। চারপাশের আওয়াজ কমে আসছে। তবু

ধিঙি মেয়ের বাড়ি ফেরার নাম নেই। মনে মনে ভাবল সুধামুখী— আজ মেয়ে তুমি বাড়ি ফের—তোমার সমুদ্রের বাই ঘুচিয়ে ছাড়ব। বড় বাড় তুমি বাড়ছ। তোমার জন্য রোজ রোজ লোকে আমাকে কথা শোনাবে—আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে সুধামুখী।

হাওয়ায় টুটুল ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে নিয়ে সুধামুখী নিচে নামতে থাকে।

নিচে নেমেই সামনের রাস্তার দিকে সুধামুখীর চোখ পড়ে। অল্প আলোয় সে দেখতে পায় কাজল ছুটতে ছুটতে বাড়িতে ঢুকছে। তাড়াতাড়ি ঘরের বিছানায় টুটুলকে শুইয়ে দেয় সুধামুখী। এবার মুখোমুখি হয় কাজলের।

কাজল যেন চোর ধরা পড়ে গেছে। তার করুণ মুখটা হঠাৎ আরো করুণ হয়ে যায়। সুধামুখীর মুখের দিকে তাকিয়েই সে আন্দাজ করতে পারে তার কপালে কি আছে। কাজল তাড়াতাড়ি মুখটা কাঁচুমাচু করে বলল, 'আর কোনো দিন করব না মা। আর কখনো এমন হবে না—এই দেখ মা, চুলে হাত দাও, একটুও ভেজাই নি, আজ আমাকে মেরো না মা—'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কি জানি সুধামুখীর কেন মারতে গিয়েও হাত উঠল না। কাজলের করুণ আবেদনের মধ্যে সুধামুখী কি দেখল। না মারলেও চোখ পাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'তোর মুখে বহুবার এই কথা শুনেছি। কালই তো এই কথা ভুলে আবার যে কে সেই হয়ে আসবি। তোকে আর বিশ্বাস করি না আমি।'

'আজকের দিনটা ছেড়ে দিয়ে দেখ মা, এই শেষবার—' কাজল নিচু হয়ে সুধামুখীর পা ধরতে গেল।

সুধামুখী ওর হাত ধরে তুলতে তুলতে বলল 'খুব হয়েছে মুখপুড়ি, পা ছাড়। আজ এই শেষবার তোকে ছেড়ে দিচ্ছি—কাল বেচাল দেখলে খুন করে ফেলব।'

কাজল কোনো কথা বলল না। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সুধামুখী সেই দিকে তাকিয়ে বলল, 'নে কান্না থামিয়ে ভাইয়ের কাছে বোস, আমি এবার রাত্রের গেলবার ব্যবস্থা করিগে।'

'কাপড়টা ছেড়ে আমি এখুনি আসছি মা।' কাজল ছাড়া পেয়ে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ির ভেতর পালিয়ে গেল।

সুধামুখী ওর দিকে তাকিয়েই রইল। নিজের মনে বিড়-বিড় করে বলতে লাগল, 'কতটুকু সময় আর! সাতটা বাজে। বাপ আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টারের মধ্যেই এসে পড়বে। এসেই ঘ্যানঘ্যান শুরু করবে, যারে পড়তে বস; তোর মা কোথায়? ভাইকে মা'র কাছে দে। যত আদিখ্যেতা!' সুধামুখী দু চোখে এ সব সহ্য করতে পারে না। এই নিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। ফলে সব রাগ জমা হয় নিরপরাধ মেয়েটার ওপর। সুধামুখী নিজেকে সামলাতে পারে না। এভাবেই কাজল বড় হতে থাকে।

দেখতে দেখতে সামনের রাস্তার ওপর থেকে দিনের আলো মরে গেল। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসে বড় বাড়িকে ঢেকে দিল।

রাস্তার আলো তখনো জ্বলে নি। সেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে বড় বাড়ির বারান্দায় একা একা এসে দাঁড়ালেন অন্নপূর্ণা। নিশ্চল হয়ে সমুদ্রকে দেখতে চাইলেন। কিন্তু সেই অন্ধকার ভেদ করে সমুদ্র দেখা গেল না। ঢেউয়ের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। ছোঁয়া লাগছে নোনা হাওয়ার। বেশ কিছুক্ষণ শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অন্নপূর্ণা। তাঁর চোখে সামান্য চিন্তার ছায়া। তিনি মনে মনে ভাবছেন, রানার ফিরতে এত দেরী হচ্ছে কেন? সে তো অনেকক্ষণ হল বেলাভূমিতে বেড়াতে গেছে।

পুরী রানার অচেনা। এই প্রথম এসেছে। এর আগে সে সমুদ্র দেখে নি। তাই সমুদ্র দেখবার জন্য পাগল হয়ে পড়েছিল।

এবেলা ওবেলা দেখেও আশ মিটছে না। অন্নপূর্ণা বাধ্য হয়ে ওই পাগলের সঙ্গে এ কদিন যাচ্ছিলেন। আজ শরীরটা খারাপ। বিকেলে আর বেড়াতে চান নি। পাগল ছেলে শুনবে না। একা ওকে ছাড়তে চান নি অন্নপূর্ণা। বিদেশ বিভূঁই। কোথায় কি হয়। কিন্তু দারোয়ান সঙ্গে নিয়ে রানা যাবে না। লোকে হাসবে। তাই শেষ পর্যন্ত একাই গেছে। বলে গেছে, 'তুমি কিছু ভেব না, সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব। এখন তাই চিন্তা হচ্ছে রানা ফিরল না কেন।

অন্নপূর্ণার চোখের মণি রানা। নিজের কোনো ছেলেপুলে হয় নি। রানা সেই অভাব পুরিয়ে দিয়েছে সুদে আসলে। রানার নিজের মা শুধু জন্মটুকুই যা দিয়েছে, বাকি সবই বড়মা।

অন্নপূর্ণাকে রানা বড়মা বলেই ডাকে। এই ডাক তাঁরই শেখানো। বড়মা যেমনি ভালবাসেন রানাও তেমনি বড়মা জেঠু বলতে অজ্ঞান রানাকে ছেলে হিসেবেই নিয়েছেন ওঁরা। ওদের দুজনের যা কিছু ভবিষ্যতই রানা।

সমুদ্র দেখার শখ রানার বহুদিনের। মাঝে মাঝেই সে বায়না ধরেছে সমুদ্র দেখবে বলে। রানার জেঠু সময় করে উঠতে পারে নি। একা কারো সঙ্গে পাঠাতে ভরসা হয় না।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পর রানাকে আর আটকানো সম্ভব হল না। কেউ না গেলে সে একাই যাবে। বাধ্য হয়ে অন্নপূর্ণাই ওকে পুরী নিয়ে এসেছেন। রানার জেঠু পরে আসবেন। পরীক্ষার ফল না বেরনোর আগে ওরা কলকাতা ফিরবে না।

সকালেও অন্নপূর্ণা রানাকে সমুদ্রে নিয়ে গেছেন। তারপর বাড়ি ফিরেই গা-টা ম্যাজম্যাজ করতে থাকে। তিনি ঘরে শুয়ে ছিলেন। রানা দুপুর শেষ হয়ে আসবার আগে থেকেই সমুদ্রের দিকে যাবার জন্যে তৈরি। অন্নপূর্ণার শরীর খারাপ সে জানে না। জামা-কাপড় পরে এসে অন্নপূর্ণার সামনে দাঁড়ায়। বলে, 'কই বড়মা, তুমি এখনো বসে আছ? বিকেল হয়ে গেল, যাবে না?'

অন্নপূর্ণা ওর দিকে তাকিয়ে স্নেহের হাসি হাসলেন। উত্তর দিলেন, 'তোর দেখছি আশ মিটছে না। এবেলা আর নাই গেলি, আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই।'

'না বড়মা, আমি যাব—তুমি চল না।' রানা অন্নপূর্ণার হাত ধরে টানাটানি শুরু করল।

'সত্যি বলছি বাবা, শরীর ভাল লাগছে না। আচ্ছা একদিন না গেলে কি হয় রে? সমুদ্র তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।'

'তা না যাক—আমি যাব বড়মা—তুমি গিয়ে চুপ করে বসে থেক। বরং তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। ওঠ।'

'বাবা রে বাবা—কি নাছোড়বান্দা ছেলে হয়েছিস তুই!' অন্নপূর্ণা উঠে বসলেন। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। কি ভাবলেন। তারপর বললেন, 'এক কাজ কর রানা, দরোয়ানকে সঙ্গে করে ঘুরে আয়।'

'দরোয়ানের সঙ্গে যাব না!' রানা ফস করে বলল, 'লোকে কি ভাববে—তার চেয়ে আমি একাই যাব।'

'একা যাবি কি রে!' বড়মার চোখ গোল হয়ে উঠল। 'তোকে একা ছাড়লে আমার শরীর যে আরো খারাপ হবে।'

'তুমি কিছু ভেব না বড়মা—' রানা অন্নপূর্ণার গলা জড়িয়ে বলল। 'এই তো সমুদ্র। সমুদ্রের পারে ছাড়া আমি আর কোথাও যাব না।'

'পারবি যেতে?'

'খুব পারব।' রানা বিজ্ঞের মত বলল, 'দেখে নিও তুমি।'

'যা তবে।' অন্নপূর্ণা ছেলের জেদের কাছে হার মানলেন। 'কিন্তু খুব সাবধান—জলের কাছে যাবে না—সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসবে, দূরে কোথাও যাবে না, কারো সঙ্গে কথা বলবে না।'

'ঠিক আছে।' রানা লাফিয়ে উঠল। এত সহজে একা যাবার অনুমতি পাবে সে ভাবতেই পারে নি। কথা শেষ করে রানা আর দাঁড়াল না। যেন হাওয়ায় উড়ে চলে গেল বাড়ির বাইরে।

একটু আগেও অন্নপূর্ণা শুয়ে ছিলেন। রানার দেরী দেখে এই মাত্র বারান্দায় উঠে এসে দাঁড়িয়েছেন।

রানা এখনো ফিরছে না। চিন্তাটা ক্রমশ ডানা মেলছে মনের ভেতর। সমুদ্রের সোঁ-সোঁ আওয়াজ যেন হারিয়ে যাচ্ছে। একটা ছটফটে ভাব, অস্থিরতা তাকে ঘিরে ধরল। আর থাকতে না পেরে তিনি দরোয়ানকে ডাকলেন।

দরোয়ান আসতেই তাকে বললেন, রানাকে খুঁজে আনবার জন্য। আর তো অপেক্ষা করা উচিত নয়।

অন্ধকার রাস্তার দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন।

দরোয়ান যাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ কাটল। কেউ ফিরছে না। একটা অস্বস্তিতে অন্নপূর্ণা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। মাত্র ঘণ্টা তিনেকের চোখের আড়াল হতেই তিনি অস্থির। নিজের মনে ভাবছেন, অথচ এই ছেলেকেই কয়েক দিন বাদে সম্পূর্ণ একা বিদেশে পাঠাতে হবে। যেখানে মাসের পর মাস একা থাকবে—একটা চিঠি আসতেও ঢের দিন লেগে যাবে, তখন তিনি বাঁচবেন কি করে! চিন্তা করে কোনো কূল কিনারা খুঁজে পান না অন্নপূর্ণা, সেদিনের কথা ভাবলেই হাত পা অবশ হয়ে যায়। কর্তার কথা ভাবেন সঙ্গে সঙ্গে। পুরুষরা বেশ, কোনো চিন্তা-ভাবনার ধার ধারে না। ব্যাপারটা নিয়ে রানার জেঠুকে বলতে গেছেন, উল্টে ধমক খেয়ে ফিরতে হয়েছে, 'এবার থেকে ছেলেকে ছেড়ে থাকবার অব্যেস কর—ওকে মানুষ করার কথা চিন্তা করো, তোমার অন্ধ স্নেহ যেন ওর ভবিষ্যৎটা না নষ্ট করে।'

উনি বলেই খালাস কিন্তু মন শক্ত করার উপায়টা বাৎলে দিতে পারলেন না।

অন্নপূর্ণা তবু ঘুরে ফিরে ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন, 'এখানে কি কেউ লেখাপড়া শেখে না? সব ছেলেই কি বিলেত দৌড়চ্ছে!'

'তা দৌড়চ্ছে না—' কর্তা এবার হেসে ওঠেন, 'বহু ছেলেই

দেশের শিক্ষাতেই বড় হয়ে উঠছে; তবু আমাদের দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা ওদেশের মতো এত উন্নত নয়—ওখানে ওর পক্ষে পড়াশোনার সুবিধে হবে—তাই পাঠাচ্ছি।'

এরপর অন্নপূর্ণা কোনো কথা তোলেন নি। ছেলের বড় হবার যুক্তিকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কই?' সত্যি কি তিনি নিজেকে তৈরি করতে পেরেছেন শক্ত করে। মনটা এমন অবুঝ হয়ে পড়ে কেন! তবে কি রানা চলে গেলে একা আমি থাকতে পারব না?

অন্নপূর্ণা নিজের দিক ছেড়ে এবার রানার হয়েই চিন্তা করতে বসেন। ফুলের মতো এইটুকু একটা শিশু। শিশু ছাড়া কি! হাতে পায়েই যা বেড়েছে, সংসার বোঝবার কোনো ক্ষমতাই হয় নি। সেই রানা বিদেশ-বিভূঁয়ে আমাকে ছেড়ে থাকবে কি করে! এত বয়স পর্যন্ত নিজে থেকে একটা কাজও করতে পারে না, রাতে একা শোবার অভ্যেস নেই—বাচ্চাদের মতো অন্নপূর্ণাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোয়। সবে ষোল পার হয়ে সতেরোয় পা দিয়েছে, সেই ছেলে একা একা যাবে বিদেশ! নাঃ, অন্নপূর্ণা ব্যাপারটা ভাবতেই পারেন না। বিষয়টা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে।

অন্নপূর্ণা মাকড়সার মতো আপনার চিন্তার জালের মধ্যে একটু একটু করে জড়িয়ে পড়ছিলেন—আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন কিছু সময়ের জন্য। হুঁশ ফিরল দূর থেকে রানার গলার শব্দে। তাড়াতাড়ি সামনে তাকালেন।

দরোয়ানের সঙ্গে গল্প করতে করতে রানা ঢুকছে। সেই চোখ মুখ। স্বর্গীয় একটা সুষমা নামে অন্নপূর্ণার চোখ জুড়ে। অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলেন। বড়মাকে দেখতে পেয়েই রানা বাচ্চাদের মতো দু হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

'আরে! ছাড়, ছাড় পাগল ছেলে!' হাসি মুখে অন্নপূর্ণা বলে উঠলেন। তার প্রাণের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

'একটা না দারুণ মজা হয়েছে বড়মা—আঃ তুমি যদি আজ!

যেতে !' বড়মাকে ছেড়ে দিয়ে মজার কথাটা বলতে গিয়ে রান নিজেই হাসিতে লুটিয়ে পড়ল।

'কিসের মজা!' অন্নপূর্ণা রানার দিকে তাকালেন।

'সে ভারী মজার—' হাসতে হাসতে বলে উঠল, 'একটা মেয়ের সঙ্গে প্রথমে ঝগড়া হয়েই পরে ভাব হয়ে গেল। মেয়েটা কিন্তু খুব ভাল।'

'বলিস কি রে!' অন্নপূর্ণা অবাক রানার কথায়! 'মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া! সে কি কথা রে! কত বড় মেয়ে? কে জানে কি বাধিয়ে এলি? কোথায় থাকে মেয়েটি?'

'বাবা রে বাবা!'—রানা বলে উঠল, 'তুমি কিছু না শুনেই নাগাড়ে প্রশ্নের ঝড় তুলে দিলে, কে মেয়ে? কার মেয়ে? কোথায় থাকে? কি বাধালি—না, তোমাকে বলব না, যাও—'

রানা রেগে গেছে বুঝতে পেরে অন্নপূর্ণা ওকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। বললেন, 'আমি আর একটা কথাও বলব না, বল বাবা কি হয়েছে—মারামারি বা অন্য কিছু করিস নি তো—' অন্নপূর্ণা ভুলে গেলেন একটু আগের কথা—'দেখি তো-কোথাও লাগে-টাগে নি তো?

'আবার শুরু করলে বড়মা!' রানা চোখ গোল করল, 'না তোমাকে বলবই না।' রানা রাগের ভান করল, 'আমি কি তোমাকে মারামারির কথা বলেছি!'

'বেশ বাবা, এই চুপ করছি।' অন্নপূর্ণা ওর মাথায় হাত বোলালেন, 'এবার বল কি হয়েছিল?'

'একা একা আমি সমুদ্রের ধার ঘেঁষে হাঁটছিলাম। তাকিয়ে তাকিয়ে বিরাট ঢেউগুলো দেখছিলাম—' রানা শুরু করল একটু আগের ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা।

'একটা মেয়ে হঠাৎ আমার চোখে বালি ছুঁড়ে মারল।'

'ও মা, বলিস কি রে!' অন্নপূর্ণা আঁৎকে উঠলেন। 'কোথাকার মেয়ে?'

'আমাদের পাশের বাড়িতেই থাকে।' রানা জবাব দিল।

'তোর চোখে কিছু হয় নি তো?' অন্নপূর্ণা সন্দেহের চোখে তাকান।

'আরে না না, কিছু হয় নি আমার—' রানা বড়মাকে থামিয়ে বলতে লাগল, 'সামান্য দু'কণা বালিতে চোখের কি হবে! তুমি সব ব্যাপারে এত ভয় পেয়ে যাও।'

'না হলেই ভাল। যাক্ বাঁচা গেল। ভাগ্যি কিছু হয় নি।' অন্নপূর্ণা দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে জগন্নাথের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, 'হে বাবা জগন্নাথ, তুমিই রক্ষে করেছ—চোখ বলে কথা। একটা কিছু হলে আমি যে কি করতাম!'

'আঃ বড়মা! আবার তুমি শুরু করলে!' রানা বিরক্ত হয়ে উঠল—'বলছি না আমার কিছু হয় নি।'

'হতে কতক্ষণ? তোকে একা পাঠানোই আমার ভুল হয়েছিল।'

'নাঃ, মজার কথাটা তুমি শুনবে বড়মা, না খালি ওই বাজে কথা বলবে?'

'হ্যাঁ, বল না কি বলছিলি, মেয়েটা তোর চোখে খামোকা বালি ছুঁড়ল কেন?'

'এমনিই।' রানা বলতে লাগল, 'ও খেলতে খেলতে যাচ্ছিল। হাওয়ায় ওর হাত থেকে বালি উড়ে এসে আমার চোখে পড়েছে। আমার মনে হয় বড়মা, মেয়েটা বোধ হয় বালি নিয়ে খেলতে ভালবাসে। পুরীতেই ওরা থাকে।'

'উড়ে চোখে পড়ল?' বড়মার বিশ্বাস হয় না। মনের ভয়টা তখনো কাজ করছে।

'তবে বলছি কি,' রানা সহজ সুরে বলে উঠল, 'আমি ওর পেছনে

ছিলাম। ও আগে আগে মুঠো ভর্তি বালি ওড়াতে ওড়াতে যাচ্ছিল। সেই উড়ন্ত বালি চোখে এসে পড়েছে।'

'তাহলে বললি যে ঝগড়া হয়ে গেল? এমনি হলে ঝগড়া কিসের?'

'ঝগড়াটাও এমনি। আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবও হয়ে গেল।' রানা এবার বেশ উৎসাহ নিয়ে বলতে থাকে, 'জানো বড়মা, ওর নামটা ভারী মিষ্টি—কাজল—আমাদের ঠিক পাশের বাড়ি মান ভবনে ওরা থাকে।'

'তাই বুঝি?' বড়মা বললেন, 'নে এবার চল, হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নে, তারপর সব কথা শুনব।'

রানা হাত মুখ ধুতে চলে গেল। অন্নপূর্ণা গেলেন ওর খাবারের ব্যবস্থা করতে।

একটু বাদেই খাবার ঘরের টেবিলে খেতে বসল রানা। একটা চেয়ারে বসে অন্নপূর্ণা ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন। এই সময় তাঁর মুখ দেখলে মনে হয় সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণাই। দু'চোখ দিয়ে স্নেহ উপচে পড়ছে। রানাকে কিছু ফেলতে দিচ্ছেন না। জোর করে করে খাওয়াচ্ছেন।

অনেকক্ষণ লাগল রানার খেতে। সে অনেক কিছুই খায় না। অথচ বড়মার জন্য না খেয়ে পারে না। এটা ওটা খুঁটে খুঁটে খেতে হয়। বাইরে তখন একটু একটু করে রাত নামে। রাস্তার লোকের কোলাহল কমতে থাকে। সেই সঙ্গে বাড়ে সমুদ্রের গর্জন। একটা একটানা সোঁ সোঁ ডাক রহস্যের মতো মনে হয়।

নীল আকাশে একরাশ তারা ছড়িয়ে পড়ে। চারপাশের বাড়িগুলো কালো অন্ধকারের মধ্যে মুছে যায়। শুধু বড় বাড়ির বারান্দায় হ্যাজাকটা জ্বলতে থাকে। রাস্তা থেকেও এই জাতের আলো আর কোথাও দেখা যায় না। হ্যাজাকটার জন্যই আলাদা করে চেনা যায় বড় বাড়িকে।

রাত গভীর হলে এক সময় দারোয়ান হ্যাজাকটা নিভিয়ে ফেলে। বড় বাড়িও এবার সকলের সঙ্গে অন্ধকার সমুদ্রে ডুব মারে।

রানা তার বড়মার কোলের কাছে শুয়ে বিকেলের অসমাপ্ত গল্প শেষ করে। অন্নপূর্ণা ছেলের গায়ে হাত রেখে মন দিয়ে ওর কথা শোনেন।

রানা বলে, 'বড়মা, পেছনের বারান্দায় দাঁড়ালেই কাজলদের বাড়ি দেখতে পাবে। আমাদের বাড়ির সঙ্গে একদম লাগোয়া। আমরা একসঙ্গে ফিরলাম। বাড়িটা ও আমাকে দেখাল। ওরা এত কাছে থাকে ভাবতেই পারি নি।'

কথা বলতে বলতে কখন এক সময় রানা ঘুমিয়ে পড়ে। অন্নপূর্ণার চোখে ঘুম আসে না। এক একবার তন্দ্রা আসে আবার তা কেটে যায়। তিনি তাই শুয়ে শুয়ে নানা ভাবনায় ডুবে যান। রানার বলা মেয়েটা, ওই কাজল না কি নাম, তার কথাও মনে ভিড় করে। উনি কাজলের কথা ভাবেন। কাজলদের বাড়ির কথা ভাবেন।

এখানে আসবার পর অন্নপূর্ণা বেশ কয়েকবার এ বাড়ির পিছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। অনেকবারই একটা মেয়ের কান্না তাঁকে কৌতূহলী করেছে। জানতে ইচ্ছা হয়েছে, মেয়েটা অমন করে কাঁদে কেন। জানতে পারেন নি। বারান্দায় দাঁড়ালে বাড়িটা দেখা যায় কিন্তু ভেতরের কিছু চোখে পড়ে না। এখন অন্নপূর্ণা বুঝতে পারেন ওই মেয়েটাই কাজল। কিন্তু মেয়েটা কেন যে কাঁদে তা বুঝতে পারেন না। তাঁর মমতা ভরা মনে একটা প্রশ্ন জাগে, কোনো বাপ-মা কি সন্তানের এমন কান্না নির্বিকারে শুনতে পারে। রানা কাঁদছে এমন একটা দৃশ্য কল্পনা করলেই তো তাঁর প্রাণটা হু হু করে কেঁদে ওঠে। বুকের ভেতর একটা ভয় দাপাদাপি শুরু করে দেয়। কত সাধ্য সাধনা কত কষ্টের পর জোগাড় করেছেন ওই শিবরাত্রির সলতে।

কি ভাগ্যি ছোট বউ তাঁর হাতে রানাকে তুলে দিয়েছিল নিঃশর্তে।

বহু মানত কবচ-তাবিজ করেও ঈশ্বরের এই এক মহা অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন নি অন্নপূর্ণা। রানাকে না পেলে কি নিয়ে এতকাল কাটাতেন তা আজ আর কল্পনা করতে পারেন না।

ঘুমন্ত রানার ঢলঢলে মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মাথায় হাত বুলোতে থাকেন অন্নপূর্ণা। পেটে না ধরলেও তাঁর সমস্ত বুক জুড়ে রানার অস্তিত্ব। একটু একটু করে চোখের সামনে বেড়ে উঠেছে। শিশু থেকে কিশোর। কিশোর থেকে তরুণ।

মমতা ও স্নেহভরা ছুটো চোখ মেলে ঘুমিয়ে পড়া রানাকে তিনি বারবার দেখেন। রানার মুখে গোঁফের রেখা এখন স্পষ্ট। আর ক'দিন বাদেই এই রানা যুবক হবে। যুবক হবার সন্ধিক্ষণে রানা আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে। বোজা চোখের পাপড়ি এক হয়ে রয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ কাজল পরিয়ে দিয়েছে। কচি মুখখানায় দেবশিশুর সারল্য ফুটে উঠেছে। জীবনের জটিলতাহীন মুখটা মাখনের মতো নরম।

অন্নপূর্ণা আর থাকতে পারেন না। ভেতরে স্নেহ উথলে ওঠে। তিনি ঘুমন্ত রানার কপালে ছোট্ট করে চুমু এঁকে দেন। সেই আদর পেয়ে রানা ঘুমের মধ্যে পাশ ফেরে।

হঠাৎ অন্নপূর্ণার মনে পড়ে যায়, ঠিক ঘুমনোর আগে রানা তাঁকে বলে শুয়েছে, সকলেই নাকি কাজল নামে মেয়েটা রানাকে ডাকতে আসবে। ওরা ভোরে সমুদ্রে বেড়াতে যাবে। অন্নপূর্ণা যেন তাকে ডেকে তুলে দেয়।

অন্নপূর্ণা বাধা দিয়ে বলেছেন, 'না, কাল সকালে কোথাও যাওয়া হবে না। ভোরে আমরা পুজো দিতে মন্দিরে যাব। ধুলো পায়ে দর্শনই বিধি। এখনো তা হয়ে ওঠে নি।'

রানার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল এই কথায়—'কাল না গেলে হয় না বড়মা?'

'আমি যে বলে রেখেছি। সব ব্যবস্থা করে রেখেছি—কাল না গেলে পাণ্ডা বসে থাকবেন।' অন্নপূর্ণা বলেন।

রানা আর কিছু বলে নি। বড়মার কথার প্রতিবাদ সে করে না। আগে থেকে ব্যবস্থা করা, এখন পাল্টালে খুব খারাপ দেখাবে। তাই কথা না বাড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সাতপাঁচ কথা ভাবতে ভাবতে অন্নপূর্ণাও একসময় চোখ বোজেন। এবার তিনি রানার মাথায় হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়েন।

পাখিদের কলকাকলিতে রাতের অন্ধকার ধীরে ধীরে তার ডানা গুটিয়ে নেয়। পুব আকাশে ভোরের আভাস দেখা দেয়। একটু বাদেই সমুদ্রের জলে সূর্যের সোনা রঙ ঝিকমিকিয়ে উঠবে। আপাতত সারা দিগন্ত জুড়ে লাল রঙের প্রতিশ্রুতি।

কথা মতো কাজল চলে আসে।

পাখির ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। রাস্তায় তখনো আবছা অন্ধকার। আগের দিনের সন্ধ্যের কথা মনে পড়ে যায়। বড় বাড়ি থেকে রানাকে ডাকতে হবে। তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে সাগর তীরে। দুজনে দাঁড়িয়ে ভোরের সূর্য ওঠা দেখবে। মনের মধ্যে একটা খুশির হাওয়া দাপাদাপি করতে থাকে। কাজলের মনে হয়, রানা নামটা কি মিষ্টি।

এক দৌড়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। ছুটে চলে আসে বড় বাড়ির দিকে। বিরাট লোহার দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

গেটের কাছে এসে কাজল প্রথমটা থমকে যায়। একটা ভয় এতক্ষণে উঁকি মারে। আজ পর্যন্ত কোন দিন সে বড় বাড়ির দরজার ওপাশে যায় নি। আজও ঢুকতে তার পা ওঠে না। যদি দারোয়ানরা তাকে ধরে মার লাগায়।

গেটের বাইরে থেকে কাজল এদিক-ওদিক তাকায়। ভাল করে আলো ফোটে নি। কাউকেই সে দেখতে পায় না। একটুক্ষণ

দাঁড়িয়ে ভাবে, ফিরে যাবে কিনা। তার মনস্থির করবার আগেই ভেতর থেকে দারোয়ানকে আসতে দেখা যায়। কাজল ফিরবার জন্যই ঘুরে দাঁড়ায়। দারোয়ানকে ওর ভীষণ ভয়। কি দরকার সকালে ঝামেলায় জড়াতে। দারোয়ানই ওকে ডাকে, 'আরে বিটিয়া, কাঁহা যাতা হ্যাঁয়, অন্দর আও।'

'আমাকে বলছ?' কাজল চমকে যায়। তার বিশ্বাস হয় না।

'হঁা, তুমহাকে বলছি—' দারোয়ান গেট খুলে ধরে—'অন্দর চলা যাও—কুছ ডর নেহী।'

কাজল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কথার উত্তর দেয় না। যেন বোবা হয়ে গেছে। একটু বাদে সাহস পেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। তবু তার চোখ থেকে সংশয় পুরো ঘোচে না।

'খোকাবাবুকো মাঙতা—অন্দর যাকে ঠারো, আভি হাম বোলা দেতা হ্যায়।'

দারোয়ানের ডাকবার দরকার হয় না। রানা নিজে থেকেই ছুটে আসে। কাজল আসবে এ কথা মনে করেই সে নিচে আসছিল।

একমুখ হাসি রানার। পরনে স্লিপিং স্যুট। তাকে দেখে কাজলও হাসে। অবাক হয় রানার ওই বিচিত্র পোশাক দেখে। এর আগে এমন পোশাক সে দেখে নি। ততক্ষণে তার ভয় ভয় ভাবটা পুরো কেটে গেছে।

সহজ সুরে কাজল জিজ্ঞেস করে, 'এ মা, কি রকম ঢোলা ঢোলা বিচ্ছিরি জামা পরেছ! এ আবার কি কিম্ভূত পোশাক! এই পরে কি ঝিনুক কুড়োনো যায়?'

'এ হল রাত্রে ঘুমোনোর পোশাক—' হেসে উত্তর দেয় রানা, 'তুমি বুঝি এরকম পোশাক কোন দিন দেখ নি?'

'আমাদের এখানে ওসব কেউ পরে না। যাই বল, খুবই বিচ্ছিরি দেখতে।'

'শহরে প্রায় লোকই পরে।'

'পরুক। আমার তা জেনে দরকার নেই। কই, চল।' কাজল তাড়া লাগায়।

রানার মুখটা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। এক কথায় সে ওকে ফেরাতে পারে না।

কাজল তাড়া লাগায়, 'এরপর সূর্য উঠে পড়বে।'

'আজ আর আমার যাওয়া হবে না কাজল।' বিরস মুখে ব্যথিত স্বরে রানা বলে, 'তুমি একাই যাও।'

'সে কি!' কাজল আকাশ থেকে পড়ে। তার মনের ভেতরের খুশির বাতাসের দাপাদাপি থেমে যায়। করুণ কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করে, 'কেন? তোমার বড়মা বারণ করেছেন?'

'না-না' রানা ওকে ব্যাপারটা খুলে বলে, 'আমি জানতাম না বড়মা আজ মন্দিরে যাবার দিন ঠিক করেছেন—এখুনি আমরা মন্দিরে যাব, তাই যেতে পারছি না, তুমি কিছু মনে কোরো না—'

'কখন ফিরবে?'

'তাড়াতাড়িই ফিরে আসব।'

'ফিরে সমুদ্রে চান করবে তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় করব—' রানা উত্তর দেয়। তার মুখেচোখে খুশি ঝকমক করে ওঠে—'তুমি তখন আসবে তো আবার? একসঙ্গে যাব, তাহলে বেশ মজা হবে আমাদের নুলিয়াটা আবার ভীষণ দেরী করে।'

'কে তোমাদের নুলিয়া?'

'তুমি কি সবাইকে চেনো?'

'প্রায় সবাইকেই চিনি—' কাজল উত্তর দেয়, 'তোমাদের নুলিয়ার নামটা বল না—'

'জং বাহাদুর।'

'ও জং বাহাদুর!' কাজল হেসে ওঠে—'ওকে আমি খুব চিনি।'

'সত্যি?'

'সত্যি।' কাজল মাথা হেলায়—'জানো, আমি না জং বাহাত্বরের সমান সমান যেতে পারি। বহুদিন নৌকো করে জং বাহাত্বরের সঙ্গে মাছ ধরতে গেছি। উঃ, সে কি দারুণ মজা! তা তোমাকে বলে বোঝানো যাবে না। আচ্ছা, তুমি সাঁতার জানো?'

'জানি, তবে সে এলেবেলে সাঁতার।' রানা উত্তর দেয়, 'ঢেউ দেখলে আমার ভীষণ ভয় করে।'

'তাই বুঝি!' কাজল ওর কথায় খিলখিল করে হেসে ওঠে—'এবার আমি সঙ্গে থাকলে দেখো তোমার একটুও ভয় করবে না। জানো আমরা সব বন্ধু একসঙ্গে স্নান করতে যাই।'

'আজ কিন্তু অন্য বন্ধুদের এনো না।' রানা কি ভেবে বলে।

'কেন?'

'এমনি—আজ শুধু আমরা তুজনেই যাব।'

'বেশ, তাই হবে।' কাজল উত্তর দেয়. 'কোন্ ঢেউয়ে ভাল ঝিনুক আসে তাও তোমায় দেখিয়ে দেব। এ সব আমি জানি। জং বাহাত্বরই আমাকে শিখিয়েছে।'

'জং বাহাত্বর বেশ বুড়ো, তাই না?' রানা বলে ওঠে।

'বুড়ো হলে কি হবে, লোকটা যেমন ভাল তেমনি সাহসী। এ তল্লাটে ওর সঙ্গে এখনো কেউ এঁটে উঠতে পারে না। সমুদ্রের সব কিছু ও জানে।'

'কি ব্যাপার?' হঠাৎ রানার খেয়াল হল, 'তুমি যে খুব গল্প জুড়ে দিয়েছ, আর কখন সমুদ্রে যাবে?'

'ভাবছি এখন আর যাব না—' কাজল উত্তর দিল, 'একা একা ভাল লাগবে না। সেই তোমার সঙ্গে একবারই যাব।'

'তাহলে এখন তুমি কি করবে?'

'বা রে! আমার যেন আর কোনো কাজ নেই?' কাজল বলে উঠল।

'কি কাজ?'

'প্রথমে ফুল তুলে কিষণজির মন্দিরে যাব। কিষণজিকে আমার খুব ভাল লাগে।' কাজল বলতে থাকে, 'প্রায় রোজই ফুল তুলে মন্দিরে দিয়ে আসি। মন্দির থেকে ফিরে চটপট বাড়ির কাজ করে নেব। কাজ ফেলে রাখলে মা চান করতে যেতে দেবে না।'

'তুমি কিন্তু ঠিক সময় মতো এসো—না হলে আমি ভীষণ রাগ করব।'

'এগারটা নাগাদ আমি আসব—' কাজল বলল, 'এর মধ্যে তোমরা নিশ্চয়ই ফিরবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ' রানা মাথা হেলাল—'ওই কথা রইল, এবার আমি তাহলে ভেতরে যাই। তুমি আসবে?'

'না না।'

'না কেন?' রানা ওর হাত ধরল, 'লজ্জার কিছু নেই। বড়মা তোমায় দেখলে খুশি হবেন। কাল তোমার গল্প করেছি।'

'আজ নয়—' কাজল হাত ছাড়িয়ে নিল—'আর একদিন যাব'

হঠাৎ কি মনে পড়ায় কাজল বলল, 'আচ্ছা, তোমরা এখানে কতদির থাকবে?'

'আমার পরীক্ষার রেজাল্ট বেরনো পর্যন্ত।'

'কি পরীক্ষা?' কাজল জানতে চাইল।

'স্কুল ফাইনাল। পরীক্ষার ফল বেরোলেই আমরা কলকাতা ফিরে যাব।' রানা জানাল।

'তারপর আবার কবে এখানে আসবে?'

'কে জানে!' রানার চোখ মুখ উদাস হয়ে পড়ে ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে। তারপর বলে, 'জেঠু বলেছেন, পরীক্ষার ফল বেরোলেই আরো পড়াশোনার জন্য আমাকে বাইরে পাঠিয়ে দেবেন। তা ধর কমপক্ষে চার পাঁচ বছর পড়াশুনো করতে হবে। তারপর দেশে ফিরব। সুতরাং এখানে আসার কথা বলা খুবই মুশকিল।'

'বাইরে! সে আবার কোথায়?' কাজল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'বাইরে মানে বিদেশে—যেখানে নানা ধরনের লেখাপড়া শেখা যায়।'

'ইস, তোমার কি মজা, তাই না?' কাজল বলে উঠল, 'সমুদ্রের ওপরেই তো অনেক দিন থাকতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই জাহাজে করে যাবে?'

'হ্যাঁ, জাহাজেই যাব। বড়মা কিছুতেই প্লেনে যেতে দেবেন না। ওঁর প্লেনে ভীষণ ভয়।'

'বিদেশে কত কি দেখবে, কত কি শিখবে।'

'তবু আমার একটুও ভাল লাগবে না।' রানা বলল।

'কেন?' কাজল এই কথায় অবাক হল।

'সঙ্গে কেউ থাকবে না—' রানা বলতে লাগল, 'ভেবে দেখ তো, একা একা অতদূর যেতে কারো ভাল লাগে? যেখানে আমার কথা কেউ বুঝবে না, মন খুলে কাউকে কিছু বলতে পাব না। সেখানে মন টেঁকে?'

কাজল হেসে উঠল। রানার কথা উড়িয়ে দিল হাসির ঘায়ে। বলল, 'ওখানে গেলে দেখবে কারোর কথা মনেই পড়বে না। তুমি সব ভুলে যাবে।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'সবাই তাই বলে।'

'আমি সকলের মতো না, আমার খুব কষ্ট হবে।'

'যাবার আগে এ রকম কথা সবাই বলে—' কাজল উত্তর দেয়, 'আচ্ছা মশাই দেখা যাবে।'

ভেতর থেকে বড়মার ডাক শোনা গেল। তিনি রানাকে ডাকছেন। রানা সাড়া দিল। তারপর কাজলকে বলল, 'এখন

যাই, বড়মা ডাকছে। মন্দির থেকে ফিরে এসে দেখা হবে। তুমি এগারোটায় আসছ?'

'হুঁ'—কাজল ঘাড় কাৎ করল।

রানা ভেতরে ঢুকে গেল। যেতে যেতে আবার বলে গেল, 'এসো কিন্তু কাজল, আমি অপেক্ষায় থাকব।'

সামান্য সময় কাজল দাঁড়িয়ে থেকে ফিরতি পথ ধরল। তখন পুরো আলো ফুটে উঠেছে। রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়েছে। সূর্যের আলোয় জেগে উঠেছে চারদিক। সেই নরম সোনালী আলোর মধ্যে হাঁটতে কাজলের খুব ভাল লাগল। এই আলোয় সে আগেও বহুদিন বহুবার হেঁটেছে কিন্তু এমন মনে হয় নি। ফুল তুলে কিষণ-জির মন্দিরে যাবার কথা ভুলে গেল সে, আস্তে আস্তে নিজের বাড়িতেই ফিরে গেল।

সমুদ্রসৈকত পুরী।

এই সমুদ্র পুরীর অর্ধেক আকর্ষণ। সমুদ্র দেখবার জন্য কত লোক যে পুরীতে ছুটে আসে তা গুণে শেষ করা যায় না। বছরের সব সময় দেশী বিদেশী নানান ধরনের পর্যটক আসছে যাচ্ছে। তাই শহরটা গমগম করছে জনসংখ্যার চাপে।

সমুদ্র ছাড়া পুরীর আরো একটা বাড়তি আকর্ষণ আছে। তা হল শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু ও তাঁর মন্দির। হিন্দু তীর্থস্থানের মধ্যে নীলাচল খুবই প্রসিদ্ধ। তাই দূর দূরান্ত থেকে অগণিত তীর্থ-যাত্রী আসে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে। যারা হিন্দু নয়, তাদের কাছে মূর্তি কোনো মায়া সৃষ্টি না করলেও বিরাট মন্দিরের ভাস্কর্য মনকে টেনে ধরে।

একদিকে নীল সমুদ্রের উদ্দাম কলরব, অন্যদিকে শ্রীভগবান জগন্নাথ-দেবের প্রসন্ন দর্শন, সেই সঙ্গে পুরী মন্দিরের স্থাপত্য—সব মিলিয়ে পুরী শহর ভারতের মানচিত্রে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

গ্রীষ্মে পর্যটকের ভিড় অন্য সময়ের চেয়ে কিছু বেশি থাকে। গরমের সময় মনোরম আবহাওয়া—তার প্রধান কারণ নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় সকলে শরীর জুড়িয়ে নিতে চায়। স্বাস্থ্যোদ্ধার ও বায়ু পরিবর্তনের জন্যে বহু মানুষ ছুটে আসে পুরীর সমুদ্রতীরে।

গ্রীষ্মের বিকেলে দীর্ঘ বালুবেলা জুড়ে লোকের মেলা বসে যায়। নানা ধরনের লোক। তাদের নানা ধর্ম, নানা ভাষা। বিভিন্ন জাতের মানুষ এক এক জায়গায় দল বেঁধে বসে গল্প করে। গল্প গান হৈ হল্লা। বহুজনের বন্দী মন সাগরের হাওয়া পেয়ে যেন সী-গালের মতো পাখা মেলে। আনন্দে মুক্ত প্রাণ ডানায় ভর করে উড়ে বেড়ায়।

কেউ কেউ ঘুরে বেড়ায় বালি ভেঙে ভেঙে। রঙ বেরঙের ঝিনুক কুড়োয় ছেলেমানুষের মতো। বালি ছোঁড়ে এ ওর গায়ে। ঢেউয়ে শাড়ি জামা ভেজায়। তারপর অকারণ মজা পেয়ে উচ্চকিত হাসিতে ফেটে পড়ে।

সকাল বিকেল সূর্য ওঠে, অস্ত যায় সমুদ্রের কোল ঘেঁষে। সেই সময় সূর্যের লাল রঙ পর্যটক ভ্রমণার্থীদের চোখে অপূর্ব এক মায়ারী দৃশ্য রচনা করে—যা দেখতে দেখতে সকলের চোখ অবাক বিস্ময়ে অপার্থিব এক তৃপ্তি অনুভব করে।

একেক দল মানুষ আসে।

ক'দিন দাপাদাপি করে প্রাত্যহিক জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে প্রাণভরে খুশির ঝিনুক কুড়িয়ে নেয়। ছুটি ফুরিয়ে গেলে ওই ভাল লাগা মুহূর্তগুলো স্মৃতির কৌটোয় ভরে নিজেদের ডেরায় ফিরে যায়। তাদের শূন্য করে রেখে যাওয়া জায়গা ভরিয়ে তোলে নতুন আরেক দল। সমুদ্রতীরে দুবেলা উপচে-পড়া লোকের ভিড় লেগেই রয়েছে। এ ছাড়াও ভিড় হয় স্নানের সময়। সমুদ্র-স্নান আগত মানুষদের কাছে একটা স্পোর্টস। তার একটা আলাদা আমেজ, আলাদা আনন্দ। সেই আনন্দের ভাগ নেবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

স্নানার্থী মেয়ে পুরুষের পাশে জীবিকার জন্য ভিড় করে নুলিয়ারা। অভ্যাস না থাকলে নিজে নিজে সমুদ্রে স্নান করা যায় না। ঢেউয়ের আঘাতে আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ভয় থাকে দূরে ভেসে যাওয়ার। নুলিয়ারা সমুদ্র সন্তান যেন। ওরা জানে ঢেউয়ের ছলাকলা। তারা তাই সাহায্য করে নতুন আসা উৎসাহী মানুষদের। সকলকে নির্বিঘ্নে স্নান করিয়ে তারা পরিবর্তে কিছু পয়সা নেয়। একদল নুলিয়ার সারা জীবন নির্ভর করে এই রোজগারের ওপর।

কাজল ভিড়-করা নুলিয়াদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। তার কিন্তু পয়সার দিকে কোনো লোভ নেই। তার কৌতূহল অন্য জায়গায়। সে নতুন নতুন মানুষ খোঁজে। পুরীতে আসা টাটকা আনকোরা নতুন মুখ। কোন খুশি ভরা পরিবার। কাজল তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয়। তাদের খুশিতে খুশি হয়ে গলা মেলায়। এই কাজে সে কেমন এক মজা পায়। আর সেই মজা পেতে গিয়ে বেমালুম ভুলে যায় বাড়ির কথা। ভুলে যায় মা'র বকুনির কথা।

যাদের সঙ্গে কাজল পরিচিত হয়ে পড়ে, তারা যেদিন চলে যায়, কাজল মনমরা হয়ে পড়ে। অবশ্য তার এই ভাবটা খুব বেশিক্ষণ থাকে না। সে কিছু সময়ের মধ্যে আরেকটা নতুন দলকে ধরে। তাদের সঙ্গে জমিয়ে নেয় সামান্য সময়ে। এভাবে পুনরাবৃত্তির মতো প্রতিটি পুরনো দল ফিরে আসা কাজলের মনের মধ্যে। যেটুকু পার্থক্য—তা খুবই স্বাভাবিক বলে কাজলের গায়ে লাগে না। সব দলই তার কাছে একই অর্থে হাজির। কাজল বুঝতে পারে যেমন ভাবেই মিশুক সবাই ক্ষণকালের তার কাছে, কেউই থাকতে আসে নি। যাবার আগে কোনো দলের কেউ বলে, 'কাজল, কাল আমরা চলে যাচ্ছি।'

হঠাৎ যাবার কথা শুনে কাজল অবাক হয়ে বলে, 'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ।'

'এ জায়গাটা কি আপনাদের আর ভাল লাগছে না?'

'দূর বোকা—তা হবে কেন? ভাল লেগেছে বলেই তো বেড়াতে এসেছি।'

'তাহলে চলে যাচ্ছেন যে বড়?'

'ছুটি ফুরিয়ে গেছে যে।' জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে তারা উত্তর দেয়। গলাটা ভারী শোনায় তাদেরও।

'আপনারা আবার আসবেন?' কাজল তার চোখ দুটোয় বেদনা ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করে। যেন আপনজনকে পুনরায় সে দেখতে পাবে কি না তাই জানতে চায়।

পরিবারের কর্তা বুঝতে পারে ওর মনের শূন্যতা। সে ওর কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে উত্তর দেয়, 'দেখি, শ্রীজগন্নাথ যদি টানেন তো সামনের বছর ছুটি পেলে আবার আসব।'

অনেকেই আসব বলে। 'আসব না' এ কথাটা প্রায় কেউই বলতে চায় না। আসলে, ইচ্ছে তো থাকেই। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ আর ফিরে আসে না। তবু তার ভেতরই দু-একজন দ্বিতীয়বার আসে। এমন একদল মানুষের সঙ্গে সেদিন কাজলের দেখা হয়েছিল।

মাত্র ক' মাসের ব্যবধানে ওরা আবার পুরী এসেছে। কর্তার বাতের অসুখ। সমুদ্রের হাওয়ায় ভাল থাকে তাই ঘুরে এসেছে। কর্তা গিন্নি দুজনে বসে ছিল সমুদ্রের ধারে। কাজল প্রতিদিনের মতো ঘুরছিল। ওকে দেখেই সেই গিন্নি চেঁচিয়ে কর্তাকে বলল, 'ও মা, ওই দেখ, কাজল যাচ্ছে।'

'কাজল!' কর্তাও সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকায়। এবং দেখতে পায় ঝাঁকড়া এক মাথা চুল নিয়ে শাড়ির আঁচল লোটাতে লোটাতে কাজল যাচ্ছে।

হঠাৎ নিজের নাম শুনে কাজল ফিরে তাকায়। দূর থেকেই ওদের দেখে চিনতে পেরে এক দৌড়ে কাছে যায়। 'ও মা! আপনারা কবে এলেন?' কাজলের মুখে খুশির হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

যেন খুব আপনজনকে সে পেয়ে গেছে। হাঁটু গেড়ে বালির ওপর ওদের পাশে বসে।

'এই তো আজ সকালেই এসেছি।' ভদ্রমহিলা ওর গাল টিপে আদর করে জবাব দেয়। 'তারপর তুমি কেমন আছ?'

'খুব ভাল।' কাজল ঘাড় কাৎ করে—' আপনাদের জন্য কদিন খুব মন খারাপ হয়েছিল। কি মজা, আপনারা আবার ফিরে এলেন।'

'তোমার জন্যই এলাম।' ওকে খুশি করবার জন্যই কর্তা এবার বলল, 'খুব খুশি হলাম তোমাকে দেখে। যে ক'দিন থাকব তুমি রোজ এসো কিন্তু। ভারী ভাল লাগবে।'

'আসব।' কাজল উঠে পড়ল। পুরনো পরিচিত চেনা মানুষদের নতুন করে পেয়ে কাজলের মন গুনগুনিয়ে উঠল। সে দৌড় লাগাল সামনের দিকে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

ওরা এক মাস ছিল।

এই দীর্ঘ একমাস কাজল প্রত্যেক দিন কমপক্ষে একবার ওদের সঙ্গে দেখা করেছিল। এবার কেবল কর্তা গিন্নি দুজনে এসেছে। ছেলেমেয়েরা আসে নি। তাতে কাজলের কোনো অসুবিধা হয় নি। সব বয়সী মানুষই তার মনের মতো। বুড়ো থেকে শিশু কোনো বয়সের লোকের সঙ্গে মিশতে তার আটকায় না।

এভাবে ক্রমশই কাজলের পরিচিত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। যদিও সে সকলের নাম ঠিকানা মনে রাখতে পারে না। তবু সবাই ফিরে ফিরে আসুক, এখানে থাকুক—কাজল জগন্নাথদেবের কাছে এই প্রার্থনা করে। সে শুধু মিশতে চায় সমুদ্র অভিলাষী মানুষদের সঙ্গে। এতে বয়স কোনো বাধা না।

আলাপ করতে কাজলের জুড়ি নেই।

বহু লোকের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। অবশ্য এই আলাপ বিভিন্ন ধরণের। কারো সঙ্গে খুব গভীর কারো সঙ্গে হালকা। যারা

কাজলকে আপন করে নিয়েছে, কাজল সেখানে মিশে গেছে নিজের বাড়ির মতো। যারা খুব একটা কাছাকাছি আসতে চায় নি কাজলও তাদের থেকে দূরেই থেকেছে। নিজেকে ছোট করে নি অকারণ। আগেকার বহু আলাপের স্মৃতি রয়ে গেছে তার বুকে। কখনো তা মধুর কখনো তা বিষণ্ন।

কিন্তু রাণার সঙ্গে ক'দিনের আলাপে কাজল যেন নতুন একটা কিছু পেয়েছে। অদ্ভুত ছেলে রাণা। অদ্ভুত তার কথাবার্তা। মাত্র ক'টা দিনের কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই কাজল বুঝতে পেরেছে এ পর্যন্ত সে যত লোকের সঙ্গেই মিশুক না কেন, সে মেশা এমন নয়। রানার মতো আর কাউকেই আজ পর্যন্ত মনের এত গভীরে সে দেখে নি।

রানা আলাদা সবার থেকে। তার কোনো তুলনাই চলে না।

রানার সব কিছু সুন্দর। হাব-ভাব চলা-ফেরা। রানার ভেতর দিয়ে কাজল একটা নতুন পৃথিবীকে দেখতে পায়। যে পৃথিবী প্রতি-মুহূর্তে বিস্ময়ের। যার প্রতিটি ক্ষণ আনন্দের।

কাজল তার সব বন্ধুদের সঙ্গে রানার আলাপ করিয়ে দিয়েছে। রাণা ভাল ছেলে। তাই সবাই চায় রানার খুব কাছের হতে। সবাই কাজলকে হিংসে করে রানার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব দেখে। কাজল ব্যাপারটা বুঝতে পারে। সে তাই নিজের বন্ধুদের কাছ থেকে রানাকে আড়াল করে। তাকে আগলে আগলে নিয়ে বেড়ায়।

কাজল বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

সে কারো কথা বা মা'র বকুনিকে ভয় পায় না। তার ইচ্ছে হয় সব সময় রানার কাছে কাছে থাকতে। রানার কথা শুনতে। রানা কত কি জানে। কত বই পড়েছে। কাজলকে সে নানা জিনিস শেখায়। কাজল আগ্রহ নিয়ে শেখে।

কাজল পুরনো বন্ধুবান্ধব ছাড়ে। বাজে-আড্ডা বাজে কাজে একদম সময় নষ্ট করে না। বাড়িতে কোনো রকমে সুধামুখীর ফরমাশটুকু খেটে রানার কাছে যায়।

পুরনো বন্ধুরা ওর এই পরিবর্তনে ওকে ঠাট্টা করতে থাকে। বিশেষ করে প্রভা আর টুনি। তারা বলে, 'কি রে কাজল! বড়-লোক বন্ধু পেয়ে আমাদের যে একেবারেই ভুলে গেলি!'

'বাজে বকিস না!' কাজল রেগে যায়। সে বুঝতে পারে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে ওরা এই সব বলছে।

'আমরা বাজে বকছি!' বন্ধুরা হেসে ওঠে—'দিনরাত তো তোর এক মন্ত্র হয়েছে, রানা, রানা, রানা—রানা ছাড়া আর কি পৃথিবীতে মানুষ নেই!'

কাজল আর রাগে না। সে বোঝে রাগ দেখালে ওরা বেশি করে তার পিছনে লাগবে। তাই সে হেসে ফেলে। শান্ত সরল হাসি। বলে, 'তোরা তো সব দিনই থাকবি, রানা তো মাত্র কদিনের জন্য এসেছে এখানে, সে তো আর চিরকাল থাকবে না। পরীক্ষার ফল বেরোলেই চলে যাবে।'

'কোথায়?' চলে যাবে কথাটা শুনে টুনি জিজ্ঞেস করে।

'তা আমি জানি না বাপু—' কাজল টুনির একটা হাত ধরে। 'তবে রানা বলেছে, এদেশে থাকবে না, বিলেতে যাবে।'

'বিলেত কেন?' বন্ধুরা অবাক হয়।

'ও মা!' কাজল গালে হাত দেয়, 'শুনিসনি ওরা কি ভীষণ বড়লোক! তাই ওখানেই লেখাপড়া করবে।'

'তোকে আবার সঙ্গে নিয়ে যাবে না তো?' প্রভা বলে ওঠে। 'খুব সাবধান কাজল, তাহলে আমরা কিন্তু একজন বন্ধু হারাব।'

'ধেৎ!' কাজল লজ্জা পায়।

টুনি হেসে ওঠে প্রভার কথায়। প্রভা সেই হাসিতে গলা মেলায়।

কাজল আবার সহজ হয় বন্ধুদের সঙ্গে। ওদের ঠাট্টা সে গায়ে মাখে না। সে রানার গল্পই করে চলে। বন্ধুদের বুঝিয়ে বলে,

'জানিস, ছেলেটা সত্যি খুব ভাল। অত বড়লোক অথচ একফোঁটা দেমাক নেই।'

'নতুন এসেছে তো—তাই তোর অত ভাল লাগছে।' টুনি বলতে থাকে, 'প্রথম আলাপের পর কিছু দিন সবাইকেই তোর এই রকম লাগে। পরে রানা যখন চলে যাবে তুই ওকেও ভুলে যাবি। ঠিক কিনা বল প্রভা?'

'ঠিক বলেছিস।' প্রভা যোগ করে—'কতই তো দেখলাম।'

'না না, তোরা দেখিস, রানাকে আমি কোনো দিন ভুলব না। ওকে ভুলতে পারা যায় না।'

'হ্যাঁ ঢের দেখা আছে—' প্রভা মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দেয়, 'সারা পুরীর লোক তোকে চেনে কাজল, মিথ্যে আর বড়াই করিস না। গতবারই তো পল্টু ছোঁড়াটার সঙ্গে এমনি করে ঘুরতিস—ওর একটা বোন, কি যেন নাম, ও হ্যাঁ মনে পড়েছে—রুনু, তার সঙ্গেও একেবারে গলায় গলায় ছিল। তা তারা তোকে কেউ মনে রেখেছে? না তুই কাউকে মনে রেখেছিস?'

'পল্টু!' ভুরু কোঁচকাল কাজল। তারপর বলল, 'থুঃ, পল্টুর সঙ্গে রানার তুলনা! চাঁদে আর জোনাকিতে!' কাজল মুখ বিকৃত করে বন্ধুদের দিকে তাকাল। 'দুটো ভাইবোনই সমান ছিল। দেমাকে মটমট করত। মাটিতে পা পড়ত না। আমাদের সঙ্গে কথা বলতেই চাইত না। আমি তো নিজেই সেধে সেধে যেতাম। রানা ও ধাঁচেরই নয়। তোদের সঙ্গেও তো কথা বলে, ওর মধ্যে অহঙ্কার দেখেছিস কোনো?'

'সেটা যা বলেছিস। রানা সত্যিই খুব সাদাসিধে। সব সময় মুখে হাসি লেগেই আছে।' টুনি উত্তর দিল কাজলের কথায়।

সমুদ্রের ধারে সকাল বিকেল দুবেলা ভিড় হলেও স্বর্গদ্বারে তেমন লোকজন যায় না। ওদিকটায় লোকের বসতিও কম। গরমের সময়

যখন প্রচণ্ড ভিড় বাড়ে তখন আর অত বাছবিচার থাকে না। তখন ওখানেও লোকে বাড়ি ভাড়া নেয়। চোখ-কান বুজে ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে চায়।

সেদিন কাজল বেড়াতে বেড়াতে রানাকে ওইদিকটাতেই নিয়ে গেল। কথায় কথায় কাজলের আর জায়গার কথা মনে নেই।

দুজনে হাঁটছে। অনেকক্ষণ ধরে একটানা হাঁটছে। কাজলের কোনো খেয়াল নেই। সোঁ সোঁ করে মাথার ওপর দিয়ে হাওয়া বইছে। সমস্ত রাস্তায় গণগণ করছে রোদ।

'ইস কি রোদ!' রানা হাত দিয়ে চোখ আড়াল করল, 'এত তাড়াতাড়ি বেরোবার কি দরকার ছিল?' চলতে চলতে রানা কাজলকে বলল।

কাজল এই কথার কোনো উত্তর দিল না। যেন সে রানার কথা শুনতেই পায় নি। সে জলের ধার ঘেঁষে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে এক একটা বড় ঢেউ হঠাৎ ওদের সামনে এসে ভেঙে পড়ে। দুজনকেই ভিজিয়ে দেয়।

রানা অবশ্য এখন আর ঢেউকে ভয় পায় না। কি করে ঢেউ কাটিয়ে চলতে হয় কাজল ওকে তা শিখিয়ে দিয়েছে। আজকাল চান করবার সময় কাজলের হাত ধরে সে গভীর জলে চলে যায়। তারপর ফিরে আসে ঢেউয়ের মাথায় চেপে।

এ সবই কাজল তাকে শিখিয়েছে। রানার মনে হয়, কোনো নুলিয়া এত তাড়াতাড়ি ওকে এভাবে শেখাতে পারত না। কাজলকে রানার খুব ভাল লাগে। একটু যা দুরন্ত—তাছাড়া ভারী সরল। সব সময় তার কাছেই আছে। তাকে খুশি করতে পারলেই যেন ও ধন্য হয়ে যাবে এমন ভাব।

বড়মাও ওকে খুব ভালবাসেন। কাজল ওদের বাড়ির আপনজন হয়ে গেছে এ কদিনেই। ওকে ছাড়া রানাদের একটা দিনও চলে না। যে কোনো কাজেই কাজল এগিয়ে যায়।

কাজল রানা সমুদ্রে চান করে। বড়মাও মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে আসেন। কাজল তাঁকে ধরে ধরে চান করিয়ে দেয়। তারপর রানাকে নিয়ে জলের মধ্যে দাপাতে থাকে। নীল অফুরন্ত জলরাশি যেন কাজলকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কাজল ঢেউকে তুচ্ছ করে অনেক দূর চলে যায়। রানা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। একটা ছোট পাখির মতো কাজলকে মনে হয়। পরমুহূর্তে ঢেউয়ের মাথায় চেপে সে ফিরে আসে রানার কাছে।

হঠাৎ রানার একটা হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে গভীর সমুদ্রের বুকের ভেতর নিয়ে চলে। রানার ভয় ভয় করে আবার রোমাঞ্চে গা শিরশির করে। বড়মা তাই দেখে চোখ বড় বড় করে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ওরে রানা, আর যাসনে তুই। কাজল, আমার ভীষণ ভয় করছে—ও কি করছিস! শেষে কি তোরা আমাকে একটা সর্বনাশের মধ্যে ফেলবি? ফের বলছি, এখনো ফের—আর যেতে হবে না।'

'ভয় পেওনা বড়মা' কাজল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উত্তর দেয়। তখনো সে রানাকে ক্রমাগত আরো গভীরে টেনে নিয়ে চলেছে। ওরা বহু দূরে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে কাজলের গলা হাওয়ায় ভর করে ভেসে আসে, 'রানার কিছু হবে না বড়মা, আমি তো ওর সঙ্গে আছি।'

যতক্ষণ ওরা জলে থাকে ততক্ষণ একটা উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা বড়মার মনে চেপে থাকে। ডাঙায় তার পাশে দুজনে ফিরে এলে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। বলেন, 'ধন্যি মেয়ে তুই কাজল, তোর সাহস দেখে অবাক না হয়ে পারিনে—তুই না মেয়েমানুষ? তোর শরীরে কি একটুও ভয়-ডর নেই?'

কাজল উত্তর দেয় না এই কথার, অদ্ভুত নিষ্পাপ হাসি হাসে। যে হাসি দিয়ে সে মনের ভয় জয় করেছে। হেসে বোঝাতে চায় ভয় কাকে বলে তা সে জানে না। বরং অন্যে যাতে ভয় পায় সেই কাজ

করতেই তার আনন্দ। নিজের আনন্দ ঘেরা জগৎ নিয়ে কাজল তাই দিনরাত মশগুল।

পরিচয়ের দ্বিতীয় দিনেই কাজল বড়মাকে চিনে নিয়েছিল। বড়মাও হঠাৎ পুরীতে ওর মতো একটা মেয়ে পেয়ে খুব খুশি। কাজলের ওপর এই কদিনেই মায়া পড়ে গেছে। ওর কথা ভাবলেই দুঃখ লাগে। আহা রে! কি দুঃখী মেয়ে—সৎমার হাতে পড়ে মেয়েটার বরাতে খালি মার আর বকুনি। বাকি অবস্থা বলার মতো নয়। কাজলের বাবার রোজগার সামান্য। সুতরাং কোনো দিক দিয়েই সে কিছু পায় না। অবশ্য এ নিয়ে কাজলের ভাবনা নেই—বাইরে বেরনো, সমুদ্রের বুকে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া তার আর কোনো চাহিদা নেই। বড়মার ইচ্ছা হয় এমন ফুটফুটে মেয়েটাকে নিজের কাছে রাখেন।

রোদে চলতে চলতে রানা পুরনো কথায় ফিরে যায়। সে বলে, 'কি হল, আমার কথার জবাব দিলে না?'

'কি কথার?' কাজল আলগোছে বলে ওঠে।

'বা রে! তোমার তো দেখছি ভারি ভুলো মন!'

'আমি তোমার কথা শুনতেই পাই নি।'

'সে কি!' রানা অবাক হয়। সে ভাবতেই পারে না এত কাছে থেকে একজন কি করে শুনতে পায় না।

'আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।'

'যা খুশি ভাবো আমার তাতে কিছু যায় আসে না। তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, এত রোদে বেরোলে কেন? পরে বেরোলে হত না?'

'না।'

কাজলের উত্তরে রানা বিস্মিত। 'কেন?'

'অনেক দূরে যাব যে।' কাজল এবার বেশ গুছিয়ে রানার কথার

জবাব দেয়, 'বেশ খানিকটা পথ। দেরী করে বেরোলে ফিরতে রাত হয়ে যেত। আমরা দুজনেই বকুনি খেতুম। আমার মা হয় তো আমাকে মেরেই ফেলত।'

রানা বুঝল। কাজলের এ কথাটা সত্যি। এর মধ্যে সেও একদিন ওর মা'র অমানুষিক প্রহার দেখেছে। চোখ তাকিয়ে সে দৃশ্য দেখা যায় না।

আরো খানিকটা চলার পর রানা আবার সেই একই প্রশ্ন করে, 'কাজল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আহা! চলই না, একটু বাদে তো দেখতেই পাবে।'

'কেন, আগাম নাম বলতে কি বাধা আছে?'

'না না—' কাজল হেসে ওর দিকে মুখ ফেরায়। রোদ লেগে মুখটা লাল। কপালের ঘামে লেপটে রয়েছে কয়েকগাছা টুকরো চুল। বলে, 'জায়গাটার নাম কেতকীঝরা।' কাজল রানার একটা হাত ধরল—'তুমি ও-রকম জায়গা কোনো দিন দেখ নি আমি হলফ করে বলতে পারি।'

'সত্যি!' রানার চোখ চকচক করে উঠল।

'মিলিয়ে দেখে নিও। শুধু জায়গাটা সুন্দর তা নয়—ওখানে বুড়োবাবার আস্তানা আছে।'

'বুড়োবাবা আবার কে?'

'বুড়োবাবা একজন সাধু। আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। কতবার ওঁর ওখানে বেড়াতে গিয়েছি। আদর করে আমাকে লঙ্কা আম খেতে দেন। ওঁকে দেখলে তোমারও ভাল লাগবে। সবাই ওঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে।'

আগে যা ভাবা গিয়েছিল তা নয়। কাজল উদ্দেশ্যহীন ভাবে এ পথে আসে নি। সে কেতকীঝরার দিকে রানাকে নিয়ে চলেছে।

সমুদ্রর কিনার ঘেঁষে দুজনে চলেছে। হঠাৎ একটা বড় ঢেউ

ওদের সামনে এসে আছড়ে পড়ে। দুজনেরই জামা কাপড় ভিজে যায় নোনাজলের ছিটেয়।

রানার বেশ মজা লাগে। সে কাজলের মুখের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর কি মনে করে কাজলের হাত ধরে ওকে কিছুটা ওপরের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

'সত্যি বলছি রানা, জায়গাটা অপূর্ব। দেখলেই তোমার মনে হবে ঠিক যেন একটা সাজানো বাগানের মধ্যে গিয়ে পড়েছ। যেমন মরুদ্যান দেখতে হয়।'

'মরুদ্যান কি তা তুমি জানো?'

'আহা, আমি যেন মোটেই লেখাপড়া শিখি নি এমন ভাব দেখাচ্ছ।' কাজল উত্তর দেয় একটু রেগে গিয়েই, 'ভূগোল বইয়ে আছে না—মরুভূমির ধু-ধু বালির মধ্যে মরুদ্যান থাকে। এও তেমনি। চারপাশে বালি আর বালি, মাঝখানে একফালি সবুজ ছায়াঘেরা জায়গা। চারপাশে কেয়াগাছের ঝোপ। মাঝখানে একটা অদ্ভুত সুড়ঙ্গ।'

'আর কত দূর?' হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়া রানা জিজ্ঞেস করে, তারপর বলে, 'হাঁপিয়ে গেছি কাজল, তার ওপর যা রোদের তাত, এসো না একটু কোথাও বসে জিরিয়ে নি।'

'উঁহু—এখন নয়।' কাজল ওর কথায় রাজী হয় না—'ফেরার পথে কোথাও বসব!'

বাধ্য হয়ে রানাকে চলতে হয়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার পা দুখানা বালি ভেঙে কাজলকে অনুসরণ করে। আরো বেশ খানিক যাবার পর কাজল একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠে, 'রানা, ওই দেখ কেতকীঝরা—আমরা এসে গেছি।'

কাজলের নির্দেশ মতো তাকিয়ে রানা সত্যি সত্যি চতুর্দিকে বালির মধ্যে সবুজ রঙের একটা জায়গা দেখতে পায়। যেখানে ছায়ারা রহস্য ঘেরা একটা মরুদ্যান হয়ে রয়েছে।

দুজনে জোর কদমে পা চালিয়ে সেই সবুজ টুকরোর মধ্যে এসে দাঁড়ায়। রানার ভারি ভাল লাগে। কি সুন্দর জায়গা। তেমনি তার নাম—কেতকীঝরা। কেয়াবনের ঝাড় ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। সুন্দর একটা গন্ধে শরীরের ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে।

তখনো সূর্য অস্ত যায় নি। রোদ কমে আসছে। চারদিকের গাছের পাতায় লাল রঙ ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। পশ্চিম দিকের আকাশে তখন ফাগের খেলা। রানা তাকিয়ে তাকিয়ে এই দৃশ্য দেখবে ভাবছে এমন সময় কাজল তার হাত ধরে কোথায় যেন নামতে থাকে।

ওরা সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ে। কেতকীঝরার সেই সুড়ঙ্গ। ভেতরটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। রানা ভয় পেয়ে যায়। সে বুঝতে পারে না এমন অন্ধকারের ভেতর কাজল তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। একটা গা ছমছমে ভাবে শরীরে কাঁটা দেয়। রানা শুধোয়, 'এ তুমি কোথায় যাচ্ছ? ঠিক রাস্তা চেনো তো?'

'অদ্ভুত কথা বললে তো!' কাজল হাত ধরে বলল, 'কতবার এসেছি এখানে। না চিনলে অন্তত তোমাকে নিয়ে আসতাম না। তুমি কি ভাবো আমার প্রাণে ভয় নেই?'

কাজলের কথায় রানার মনের ভয় কেটে যায়। সে ভরসা পায় নতুন করে। সত্যিই তো, আর যাই হোক—অচেনা জায়গায় কাজল নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে যাবে না। রানার মাথায় এবার অন্য-চিন্তা ঘুরপাক খায়। অন্য কৌতূহল! তাই এবার সে কাজলকে জিজ্ঞেস করে, 'কাজল, লঙ্কা-আম কি জিনিস?'

'ও মা! তাইতো! তুমি তো লঙ্কা-আম দেখ নি। লঙ্কা দিয়ে আম মাখা নয় কিন্তু!' কাজল হাসে, 'এ একরকম ফল। ওই রকম নাম। খুব সাবধানে খেতে হয়। ওর ভেতর ভীষণ আঠা আছে। ঠোঁটে লাগলে ঘা হয়ে যায়।'

'সে আবার কেমন ফল!' রানা অবাক হয়। সে কোনো দিন অমন ফলের নাম শোনে নি!

সামনেই একটা ঝুপড়ি দেখা যায়। দুজনে সেই ঝুপড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। পায়ের শব্দ পেয়ে ঝুপড়ি থেকে বুড়োবাবা বাইরে এসে দাঁড়ান। একমাথা ধবধবে সাদা চুল। পরনে গেরুয়া আলখাল্লা। দেখলে আপনা থেকেই মনে একটা ভক্তি ভাব জেগে ওঠে।

কাজল নিচু হয়ে বুড়োবাবাকে প্রণাম করে। ওর দেখাদেখি রানাও। উনি দুজনকেই প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করেন। তারপর কাজলকে জিজ্ঞেস করেন, 'কি রে বিটি, এ কাকে সঙ্গে নিয়ে এলি? ভারী সুন্দর ফুটফুটে ছেলে!'

'এর নাম রানা।' কাজল উত্তর দেয়, 'কলকাতায় থাকে। পরীক্ষা দিয়ে পুরী বেড়াতে এসেছে।'

'বা, খুব ভাল লাগল রানা, তোমাকে দেখে।' বুড়োবাবা ওদের ছোলাগুড় প্রসাদ এনে দিলেন।

দুজনেই হাত পেতে প্রসাদ নিল। প্রসাদটুকু খেয়ে কাজল বলল, 'বুড়োবাবা, লঙ্কা আম খাব না?'

'ও আবার কি কথা রে বেটি!' বুড়াবাবা বলেন, 'তুই খাবি না তো কে খাবে। যা যা, এখনো আলো আছে, বাগানে যা, তুইও খা, রানা বেটাকেও দিস। ও হয়তো কোনো দিন খায় নি এই ফল। দেখ বেটা, আঠা দেখে খেও। যা কাজল, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? অন্ধকার হলে খুঁজে পাবি না।'

কাজল রানার হাত ধরে বাগানে গেল। সে আগে আগে পথ চলে কেয়াঝাড়ের মধ্যে দিয়ে রানাকে পথ দেখাল। কেয়াঝাড়ের মধ্যে মধ্যে লঙ্কা আমের গাছ। তাই রানাকে সাবধান করে দিল, 'দেখে এস রানা, কেয়াপাতায় কিন্তু ভীষণ কাঁটা আছে। লাগলেই গা ছড়ে যাবে।'

লঙ্কা আমের গাছ ভরে রয়েছে ফলে। খাওয়ার লোক কোথায় এখানে। কাজল হাত বাড়িয়ে পেড়ে নেয়। শাড়ির আঁচলে আঠা

মুছে একটা আম রানার হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'একটু ফুটো করে চুষতে থাক।'

কি জানি রানা সামান্য কি ভাবল। আমটা হাতে নিয়ে একবার তার দিকে আর একবার কাজলের মুখের দিকে তাকাল। ওর পাতলা অল্প লাল ঠোঁট দুটোয় অদ্ভুত এক টুকরো হাসি খেলে গেল। পড়ন্ত রোদে সেই হাসি কোনো শব্দ না তুলেও নির্জনতাকে ভরিয়ে দিল। কাজল তার মানে বুঝল না। শুধু কিছুক্ষণ চুপ করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

সেই সময় বাইরে বিকেল মরে আসছে। রোদের আর তাপ নেই। চারদিক চুপচাপ। কোনো শব্দ উঠছে না, ধারে কাছে মানুষজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। নীরব প্রকৃতির গাছপালার মধ্যে দাঁড়িয়ে ওরা দুজন। নিশ্চল ছবির মতো। শুধু দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের ঢেউয়ের একটানা সুর। যেন শব্দহীন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা।

আর একটু বাদেই সন্ধ্যা নামবে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে ঢেকে দেবে এই বাগান গাছপালা। চলৎশক্তিহীন দুটি মূর্তি ওরা। অনন্ত আকাশের নিচে অপেক্ষা করছে। কাজল হঠাৎ রানার চোখে চোখ রাখে। নীল সমুদ্রের মতোই গভীর। রহস্যময় কি এক দুর্নিবার ছায়াছবি সেই চোখে ফুটে ওঠে। রানাও লক্ষ্য করে একরাশ কালো মেঘের মতো চুল নিয়ে কাজল তার সামনে দাঁড়িয়ে। এই কাজলকে যেন সে চেনে না। এর এত রূপ এর আগে তার চোখে পড়ে নি। টলটল করছে রোদের মরা রঙমাখা একটা মুখ। দুজনেই তাদের এই হঠাৎ দেখা ব্যাপারের কোনো মানে বোঝে না। শুধু ভাল লাগে। অদ্ভুত শিরশির করে রক্তের চলাফেরা। যা এর আগে কোনো দিন ওদের ভাবিয়ে তোলে নি।

সামান্য সময় মাত্র। আবার সব স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। দুজনেই

সাড় ফিরে পায়। কাজল চঞ্চল হয়। সে বলে ওঠে, 'কি হল, লঙ্কা আম খাবে না ?

'এই তো খাচ্ছি।' রানাও চঞ্চল হয়—'তুমিও খাও।'

তুজনে হেসে ওঠে একসঙ্গে। যে হাসির কোনো মানে নেই।

অনেকগুলো লঙ্কা আম খাওয়া হল। প্রায় চুপচাপ ওরা আম খাওয়া শেষ করল। তারপর মাথা নিচু করে হঠাৎ কাজল বলে উঠল, 'আজকের দিনটা খুব ভাল লাগল, তাই না রানা ?'

'হ্যাঁ, খুব ভাল—' প্রায় শেষ বিকেলের দিকে তাকিয়ে রানা উত্তর দিল, 'এমন মিষ্টি ফল আমি আর খাই নি।'

'সত্যি বলছ ?'

'সত্যি! সত্যি! সত্যি!' রানা আবার হাসল—'তিন সত্যি করলাম। এমন যে একটা ফল আছে জানতামই না। ভাগ্যি তুমি তুমি আজ চিনিয়ে দিলে।'

'অনেকেই জানে না।' কাজল উত্তর দিল, 'এই নাও আর একটা।' তখনো একটা আম খেতে বাকি ছিল। কাজল সেটা রানার হাতে তুলে দিল। রানার ভাল লাগায় সে খুব খুশি হয়েছে।

আমটা হাতে নিয়ে রানা হঠাৎ বলে উঠল, 'আর নয় কাজল। এবার ফিরে চল। অনেকটা রাস্তা যেতে হবে। বাড়ি পৌঁছতে কিন্তু রাত হয়ে যাবে।'

'একদিন নয় একটু রাত হলই।'

'না না' রানা তাড়াতাড়ি বলল, 'রাত করা ঠিক নয়।'

'তোমার অত ভয় কিসের ?' কাজলের মুক্তোর মতো দাঁতগুলো ঝলসে উঠল—'তুমি তো বড়মাকে বলেই এসেছ!'

'ভয় আমার জন্য নয় কাজল, তোমার জন্য। তোমার যা মা। দেরী হলে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেবে।'

'আমার জন্য!' কাজল ভারী মজা পেল—'আমার আবার কি হবে ?'

'রোজ যা হয়।'

'রোজ যা হয়। তুমি দেখেছ তাহলে?'

'দেখেছিই তো! রোজ দেরী করে বাড়ি ফেরার জন্য তুমি মা'র হাতে মার খাও।'

'তাতে তোমার কি?'

'তুমি মার খেলে আমার কষ্ট হয় না বুঝি!' রানার গলায় অদ্ভুত সহানুভূতির সুর—'জানো, যখন তোমাকে তোমার মা মারেন তখন আমার খুব কান্না পায়। ভিতরে কেমন একটা কষ্ট হয়।'

'আমার জন্যে ভাবতে হবে না—' কাজলের গলায় আসন্ন সন্ধ্যার মতোই বিষণ্ণতা। 'ওই মার আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। একটু আনন্দ করে না হয় মারই খাব। রোজই তো এমনিই মার খাচ্ছি।'

রানা কাজলের এই কথার আর উত্তর দেয় না। হাতের শেষ আমটা জোরে জোরে চুষতে থাকে।

কাজলের মুখেও একটা আম ছিল। সে এবার সেটা চোষা শেষ করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে। তারপর পটাপট করে আরো কতক-গুলো আম ছিঁড়ে আঁচলে নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে বলে, 'চল, এবার ফেরা যাক।'

কাজল হাঁটতে শুরু করে কেয়াঝাড়ের কাঁটা বাঁচিয়ে। রানা খুব সাবধানে তাকে অনুসরণ করে। বাগানে এবার চাপ চাপ অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। কাজল হঠাৎ পিছিয়ে পড়া রানার একটা হাত ধরে।

'সাবধানে চল, নয়তো কাঁটা ফুটে একটা কাণ্ড বাধাবে।'

বাগান থেকে বেরিয়ে দুজনে বুড়োবাবার সেই ঝুপড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়।

বুড়ো বাবা ওদের দেখে হেসে বলেন, 'কি রে বিটি, আম খাওয়া হল? নতুন ব্যাটাকেও খাইয়েছিস তো?'

'হ্যাঁ বুড়ো বাবা, আমি অনেকগুলো খেয়েছি। খুব ভাল লাগল।

বহুদিন এমন চমৎকার আনন্দ করে খাই নি।'

'তোর তাহলে ভাল লেগেছে?'

'খুব ভাল লেগেছে।'

'আবার একদিন বিটির সঙ্গে চলে আসিস।' সাধুবাবা আদর করে বলেন, 'যত খুশি খেয়ে যাস। অঢেল ফল। কটা লোক আর এসে খাচ্ছে। এমনি পাখিতেই খেয়ে শেষ করে। তোরা খেলে মনটা তৃপ্ত হয়।'

'নিশ্চয়ই আসব।'

'আজ আমরা যাই বুড়োবাবা।' কাজল বিদায় নেয়। নিচু হয়ে সে আবার প্রণাম করে। অন্ধকার হয়ে আসছে। অনেকটা পথ যেতে হবে। রানাও প্রণাম করে কাজলের দেখাদেখি।

'সাবধানে দেখে শুনে যাস। ভগবান তোদের সুখে রাখুক। মঙ্গলে রাখুক।'

বিদায় নিয়ে ওরা দুজনে বাইরের পথ ধরে। সুড়ঙ্গের মুখের কাছে এসে কাজল বলে ওঠে, 'সাবধানে এস।'

রানা কোনো উত্তর দেয় না। তার মনে আবার একটু আগের ভাবান্তর ফিরে আসে। সেই ভাবটা যেন এখনো মুখ লুকিয়ে মনের ভেতরে বসে আছে। সে আনমনা হয়ে হাঁটতে থাকে।

সুড়ঙ্গ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসে রানা বুঝতে পারে আসলে এখনো সন্ধ্যা হয় নি। ঝোপেঘেরা ওই জায়গায় অন্ধকার একটু আগেই এসে পড়ায় অমন মনে হচ্ছিল।

রাস্তার ওপর পড়ন্ত বিকেলের রোদ লুটোপুটি খাচ্ছিল। যদিও বাড়ির পথ অনেক দূর। ফিরতে ফিরতে রাত হবেই। কিন্তু তাড়াতাড়ি যাওয়ায় কাজলের যেন গা নেই। সে আস্তে আস্তে যাচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে এখুনি বাড়ি ফিরতে চায় না!

বাধ্য হয়ে রানা তাকে বলে, 'এত আস্তে চলছ কেন?'

'একটা কথা ভাবছি।' কাজল উত্তর দেয়।

'কি কথা?'

কাজল রানার মুখের দিকে তাকায়। তারপর চোখে খুব আগ্রহ ফুটিয়ে বলে, 'এই রানা, চটক পাহাড়ে যাবে? তাহলে খুব মজা হবে।'

'সে আবার কোথায়?' রানা জানতে চায়—'ভারী অদ্ভুত নাম তো!'

'জায়গাটাও অদ্ভুত। এই তো কাছেই।'

'এমনিই কত দেরী হয়ে গেছে—তাহলে তো ফিরতে আরো দেরী হয়ে যাবে। শেষকালে অন্ধকারে রাস্তাঘাট হারিয়ে একটা কাণ্ড বাধাব।'

'কাণ্ড বাধলেই হল—সব রাস্তা আমার মুখস্ত।' কাজল রানার মনে সাহস জোগায়, 'আর দেরী হলে তোমার কি—মা আমাকে না হয় মারবে—ও আমার সয়ে গেছে।'

'অন্ধকারে গিয়ে লাভ কি?' রানা তবু বাধা দেয়—'কিছু দেখা না গেলে শুধু শুধু পরিশ্রম।'

'না গো না, তুমি কিসসু জানো না।' কাজল মাথা ঘুরিয়ে হাসল—'আজ চাঁদনী রাত—পূর্ণিমার আগের দিন—অন্ধকার হবে কেন?'

কাজল আর রানাকে আপত্তি করার সুযোগ দেয় না। কথা শেষ করেই বালির ওপর দৌড়তে শুরু করে।

'এই কাজল, দাঁড়াও—আরে অত জোরে দৌড়চ্ছ কেন!' বাধ্য হয়ে রানা ওর পিছনে দৌড়য়।

'এসই না—' কাজল না থেমেই দৌড়তে দৌড়তে উত্তর দেয়।

বালির ওপর দিয়ে দুজনে ছুটে চলে। আসে পাশে কোনো লোকজন নেই। হাওয়া আর সমুদ্রের শব্দ শুধু ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলে। রানার বুকের ভেতর একটা ভয়-ভয় ভাব জেগে ওঠে। সেই সঙ্গে কৌতূহলও তাকে চেপে ধরে।

ছু পায়ের ধাক্কায় বালি ছিটকে পড়ে ছুপাশে। রানাও যেন তার এতদিনের মাপা জীবনটাকে ছিটকে দেয় বেপরোয়া এক জীবনের আশ্বাস পেয়ে। যে জীবন তার কাছে অকল্পনীয় ছিল।

রানা জানে না তারা কোথায় যাচ্ছে। কত দূরে। তবু এই যাওয়া তার মনকে ছুলিয়ে দিয়ে যায়। ভয়ের সঙ্গে একটা ভাল লাগার অনুভূতি।

ওরা এক জায়গায় এসে থেমে পড়ে। রানা অবাক হয়ে যায় তার সামনে জমানো বালির পাহাড় দেখে। বালি জমে জমে উঁচু হয়ে গেছে—ওর কল্পনায় এমন একটা দৃশ্য ছিল না।

সেই পাহাড়টার কাছে গিয়ে ছুজনে বসে পড়ে। এর মধ্যেই চারপাশে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডা আলোয় ওরা গা ঢেলে দেয়। এতক্ষণ ছোটার জন্য ছুজনেই সমানে হাঁপাতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে কাজল কথা বলে, 'এই চটক পাহাড়। সুন্দর না, কি বলো?'

'পাহাড় বলো না।' রানা জবাব দেয়, 'তাহলেও বেশ উঁচু। বরাবরই কি এই এর রকম চেহারা?'

'আমি তো তাই দেখে আসছি।' কাজল বলে, 'এইখানে বালি জমে এমন পাহাড়ের মতো হয়ে আছে।'

আলো অন্ধকার ভাবটা এখন আর একদম নেই। চারদিকে আলোর প্লাবন ডেকেছে। সেই আলোয় চিকচিক করা বালিগুলো মনে হচ্ছে সোনার দানা বুঝি। চারদিকে শুধু সোনালি রঙ। ধু ধু করা সোনার ধুলোর মধ্যে বসে আছে ওরা।

রানা ক্লান্ত হয়ে বালির পাহাড়েই ঠেস দিয়ে বসেছে। ছুজনেই সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। যেন কথা ফুরিয়ে গেছে। অথচ ভেতরে ভেতরে একটা তোলপাড় চলছে। সব কিছু মিশে গিয়ে কি রকম একটা বোধ। রানা এখন তার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে। ভারি মজার ছবি। আলাদা করে কিছু

চিনে নেওয়া যাচ্ছে না। আলো বালি পাহাড় সময় কাজল সব তাল-গোল পাকিয়ে একাকার হয়ে গেছে।

সেই সঙ্গে কেমন ভয়। ভয় ভাবটা ঘুরে ফিরে আসছে। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই কৌতূহল আর ভাল লাগা তাকে চাপা দিচ্ছে। বুকের ভেতরের ঢিপঢিপ শব্দ শুনতে পাচ্ছে রানা। ইচ্ছে করলে সে গুণে ফেলতেও পারে।

হঠাৎ একটা বাতাসের দমকায় রানা শিউরে উঠল। শির-শির করল শিরদাঁড়া। সে তাড়াতাড়ি কাজলের দিকে তাকাল। খুব আস্তে বলল, 'কাজল, আর নয় এবার বাড়ি চল।'

'ও মা, এখনিই!'

'তা নয়তো কি—খেয়াল আছে কত রাত হল?'

'এখানের আসল মজাটাই তো হল না।'

'আবার কি মজা!' রানা একটু বিরক্তই হয়। এবার ভয়টা চেপে বসছে— 'থাক, আর মজার দরকার নেই।'

'একটা খেলা—খুব সুন্দর—' কাজল উঠে দাঁড়ায়। 'খেলাটা হয়ে গেলেই বাড়ি যাব, তুমিও উঠে দাঁড়াও। দেখবে ওই পাহাড়ের চুড়ো থেকে গড়িয়ে পড়ব।'

'ও বাবা! সে আবার কি!' রানা অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ায়। 'কি করে গড়িয়ে পড়বে—সারা গায়ে মাথায় বালি হয়ে যাবে যে!'

'তা হোক, কিন্তু ভীষণ ভাল লাগবে।'

'তা লাগবে—তবে হঠাৎ লেগে যেতেও পারে।'

'লাগবে কেন? দেখ না আমি কেমন করে গড়াই।'

কাজলের চোখ মুখ খুশিতে ঝলমল করে উঠল— 'কতবার আমি অন্যদের সঙ্গে এই খেলা খেলেছি। একদিনও কিছু হয় নি। আমি যখন উপর থেকে গড়িয়ে নামব, তখন নিচে পড়ার আগে ক্ষমতা থাকলে আমাকে ধরো তো। দেখব কত বড় বীরপুরুষ!'

'এ আর এমন কি একটা শক্ত কাজ!'

'অমনি মনে হয়—একবার ধরে দেখ না!'

'ঠিক আছে। তুমি ওপরে উঠে গড়াও। আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি।' রানা কাজলের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে।

কাজল তরতর করে বালি বেয়ে উঠতে থাকে। 'আগে ধরই তো, তারপর সহজ কি শক্ত বুঝতে পারবে।'

রানা নিচে দাঁড়িয়ে। তার মুখটা উঁচু করা। সে অবাক হয়ে কাজলের কাণ্ড-কারখানা দেখতে থাকে। এখনো ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকছে না।

কাজল চুড়োয় পৌঁছে গেছে। এবার সত্যি এক কাণ্ড করল সে। অদ্ভুত ফন্দি বটে। পরনের শাড়িটা দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুড়ে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরটা বালির গড়ানে ঢাল ধরে উল্টে-পাল্টে পাক খেতে খেতে ভীষণ একটা গতি নিয়ে নিচের দিকে নামতে লাগল।

রানা এবার তৈরি হয়ে দাঁড়াল। পলকহীন চোখে সে দেখতে লাগল তরতর করে কাজল নিচের দিকে চলে আসছে। শরীরটা প্রায় মাটি ছোঁয়-ছোঁয়। মাটি স্পর্শ করবার আগেই তাকে ধরে ফেলতে হবে। রানা হাত বাড়াল তাড়াতাড়ি। মাটি ছোঁবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে রানা তাকে ধরে ফেলল।

প্রথমে রানা ভেবেছিল, কাজটা খুব সহজ। কিন্তু মোটেই তা নয়। কাজলের দেহের ভার আর তার গতি দুটো মিলে ওজনটা বেশ বেশিই মনে হল।

রানা তাই ওকে ধরে ফেলেই চেঁচিয়ে উঠল, 'উঃ, কি ভারী তুমি! মনে হল এই বুঝি মাটিতে পড়লে—আমার খুব ভয় করছিল।'

'ভয়ের আবার কি আছে!' কাজলের সারা মুখ ভরা অদ্ভুত হাসি। চোখে কি যেন লেখা। রানা সেইদিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। এর আগে কাজলের এমন চোখ সে দেখে নি।

'বা রে! পড়লে তোমার লাগবে না? কি জোরে নেমে

আসছিলে। যত কাছে আসছিলে তত জোর বাড়ছিল।' রানা বেশ খানিকটা বাদে কাজলের কথার উত্তর দিল।

'সত্যিই তুমি একটা হাঁদারাম।' হাসতে হাসতে কাজল বলে উঠল, 'বালিতে পড়লে আবার লাগে নাকি। আমরা কত কতবার পড়ি। উল্টে এতে আরাম লাগে। আমার কথা বিশ্বাস না কর তুমিও ওপরে চল না, গড়াবে।'

'না, থাক।' রানা উত্তর দিল, 'তুমিই গড়াও।'

'একা একা বুঝি কারো খেলতে ভাল লাগে। তুমি যেন একটা কি—' কাজল ঠোঁট ফোলাল।

'আমি কোনো দিন এই সব বিদঘুটে খেলা খেলি নি এ খেলা আমার ভাল লাগে না।'

'খেলবে কোত্থেকে? থাক তো ইট কাঠের শহরে। সেখানে বালি পাবে কোথায়।'

'তা তুমি যাই বলো, এটায় তেমন মজা নেই।'

'না খেলে বুঝলে কি করে।' কাজল চোখ পাকাল। রানা তাকিয়ে দেখল, আবার সেই চোখ। সেই অদ্ভুত দৃষ্টি। যা রানার অচেনা।

'খেলে দেখ, তারপর বলো।'

'আমি জানি না—কোনদিন করিনি যে।'

'আরে ভয়ের কি আছে—খুব সোজা। একবার করে দেখ, তারপরই দেখবে তুমিও আর থামতে চাইছ না।'

'সত্যি বলছ!' রানা চোখ দুটো বড় বড় করে কাজলের দিকে একবার দেখল, তারপর তাকাল পিরামিডের মতো সেই উঁচু বালির ঢিপির দিকে। তখনো সে ঠিক কাজলের কথায় সায় দিতে পারছিল না।

কাজল ওকে ভাববার সময় দিতে রাজী নয়। যে মজাটা তার হচ্ছে সেটা যতক্ষণ না রানার মধ্যে জেগে ওঠে ততক্ষণ পুরোপুরি

খুশি সে নয়। আর একজনের সঙ্গে যদি ভাগ করে মজা না ভোগ করা যায় তাহলে আর আনন্দটা কোথায়! তাই সে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে হিড় হিড় করে রানাকে চটক পাহাড়ের মাথায় নিয়ে চলে।

'আঃ ছাড় না!' রানা যেতে যেতে বলে ওঠে, 'কি পাগলামী করছ! সারা গায়ে বালি লেগে যাচ্ছে।'

'লাগুক। ঝাড়লেই পড়ে যাবে।' রানার আপত্তিকে কাজল আমলই দেয় না। অবশ্য মজাটার জন্য ততক্ষণে রানার ভেতরের কৌতূহলটা জেগে উঠেছে। তার বাধা দেওয়াটা তেমন জোরালো শোনায় না।

কাজল ওকে চুড়োর মাথায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। মাথার ওপর এক আকাশ জ্যোৎস্না। দূরে সমুদ্রের একটানা হাঁকডাক। কাজল রানার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল। তারপর একটানে নিজের শাড়িটা খুলে ফেলল। রানা অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে ওর কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগল। কাজল এবার ওই শাড়িটাকে ভাল করে পেঁচিয়ে দিল রানার গায়ে। তারপর বলল, 'এবার শুয়ে পড়, ভয় নেই, গায়ে আর বালি লাগবে না।'

রানা যন্ত্রচালিতের মতো বালির ওপর শুয়ে পড়ল। কাজল ওকে জোরে নিচের দিকে ঠেলে দেয়।

রানা গড়াতে থাকে ঢালু বালির ওপর দিয়ে। গড়াতে গড়াতে নিচে নামতে থাকে। কাজল ওপর থেকে হাততালি দিয়ে বলতে থাকে, 'কি মজা রানা, এবার কেমন লাগছে?'

একেবারে নিচে এসে রাজা থামে। একটু বাদেই সে উঠে দাঁড়ায়, নিজেই ভাবে, বাঃ! বেশ মজা তো! এই মজাটা ভীষণ মনে দাগ কেটে গেল। এবার সে চুড়োর দিকে উঠতে থাকে। কাজলের পাশে পৌঁছে বলে, 'ভারি মজা তো! আবার আমি করব।'

'দেখলে তো,' কাজল হাসি মুখে বলল, 'এবার আমার কথা বিশ্বাস হল?'

'হুঁ।'

'তাহলে ?'

'তাহলে আবার কি ?' বলেই রানা নিজেই নিজের শরীরটাকে নিচের দিকে গড়িয়ে দিল। নিচে পৌঁছেই আবার উপরে উঠে এলো সে। ফের গড়াতে গেল।

কাজল হাত বাড়িয়ে ওকে বাধা দিল। 'উঁহুঁ, এবার আর একা নয়—দুজনে একসঙ্গে।'

'ধাক্কা লেগে গেলে ?' রানা ভয় পেল।

'তাহলে তো আরো মজা। উঃ, ভাবতেই মজা লাগছে।' কাজল সেই চটক পাহাড়ের চুড়োর ওপর হাততালি দিয়ে নেচে উঠল।

রানার হঠাৎ মনে হল এই কাজলকে সে চেনে না। চাঁদের আলোর নিচে শাড়িহীন শায়া-ব্লাউজ পরা কাজল যেন অন্য এক মেয়ে। যে অনেক বড় তার চেনা কাজলের থেকে। কাজলকে দেখতে দক্ষিণ ভারতীয় মেয়েদের মত লাগছে। এমন পোশাকে ওই দেশের অনেক মেয়েকে রানা দেখেছে। সমস্ত কিছু ভুলে নতুন কাজলকে নিয়ে সে ভাবতে থাকে।

'হাঁ করে দেখছ কি—কি হল তোমার ?' কাজল প্রশ্ন করল।

রানার পলকহীন তাকানো দেখে কাজল হঠাৎ কেমন লজ্জা পায়। তার মনে হয় এতদিনে রানা আর কখনো এমন করে তাকে দেখে নি।

কাজলের মাথা ঝুঁকে পড়ে মাটির দিকে। হাত দুটো আপনা-আপনি উঠে আসে আড়াআড়ি বুকের কাছে। নিজেকে সে যেন আড়াল করতে চায়। কেন তা জানে না।

রানা কাজলের কথার উত্তর দেয় না। তাকে দেখে মনে হয় কাজলের কথা তার কানে ঢোকে নি। সে যে কি বলতে চেয়েছে তা নিয়ে রানার কোন মাথা ব্যথা নেই। রানা ভাবে অন্য এক কথা। অদ্ভুত একটা চিন্তা তার মাথায় ঘুরঘুর করতে থাকে। সে তাই আরো নিবিড় করে কাজলকে দেখতে থাকে। চাঁদের অফুরাণ

আলোর মাঝখানে কাজল দাঁড়িয়ে। এইমাত্র তার মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে নিচের দিকে। অনড় শরীর। হঠাৎ বুঝি গৌতমের শাপে পাষাণ হয়ে যাওয়া অহল্যার মতো সে পাথর হয়ে গেছে। প্রাণহীন মূর্তি একটা কাজল।

রানার মনে হয় এই কাজলকে সে আদৌ চেনে না। এর শরীরে প্রচণ্ড রহস্য মাখানো। শুধু ব্লাউজ আর শায়া পরা অন্য একজন মেয়ে। যাকে রানা জানে না—কোনদিন দেখে নি। তাই রানাকে দেখতে হয়।

দেখতে দেখতে নতুন ওই বদলে যাওয়া কাজলের মধ্যে সে ডুবে যায়। সময় স্থান সব কিছু হারিয়ে যায়। কিছুর খেই খুঁজে পায় না রানা।

রানারও এবার লজ্জা করতে থাকে। এভাবে কি একজনের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়! ভাগ্যি ধারে কাছে আর কোন মানুষ নেই। রানা ভাবে সে পালিয়ে যাবে। পালিয়ে এই অস্বস্তির হাত থেকে মুক্তি পাবে।

কিন্তু পালাবে কি করে!

রানার মাথায় কোন ফন্দি জোগায় না।

এখান থেকে বাড়ি অনেক দূর। একা তার পক্ষে যাওয়া কষ্টসাধ্য। রাস্তাঘাট চেনা নেই। তাছাড়াও একটা ভদ্রতা আছে। রাতের এই সময় কাজলকে ফেলে পালাতে পারবে না।

রানাও বাধ্য হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ঠিক কি করা উচিত ভাবতে পারে না।

কাজল নিজেকে সামলে নেয়। সে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে। সামান্য মাথা তুলে খুব আলতো করে বলে, 'এই।'

এবার কথাটা রানার কানে যায়। সেও যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠে। হতচকিত বোকার মত সাড়া দেয়, 'কি?'

'কি হল তোমার?'

'কই ? কিছু না'। রানা হেসে উঠল। কিন্তু চিন্তাটাকে এড়িয়ে যেতে পারল না।

কিশোরী কাজলের শরীরটা এতদিন রানার চোখে অস্পষ্ট ছিল। সেই দেহের ভাঙাচোরা দাগগুলো নজরে পড়ে নি। আজ তা ফুটে ওঠে অদ্ভুতভাবে। এ নিয়ে কখনই রানা মাথা ঘামায় নি। তার কাছে ছেলে আর মেয়ের শরীরে কোন আলাদা ব্যাপার আছে কি না এ প্রশ্ন দেখা দেয় নি। যদিও কাজলের সঙ্গে বহুদিন সে স্নান করেছে সমুদ্রে। তার ভিজে কাপড়ের নিচে বাঁকচোরা দাগগুলো আগে তো এমনিই ছিল। কিন্তু তাহলেও রানাকে তা কোনদিন এমন ভাবায় নি।

আজকের এই বিকেলটাই বোধ হয় আলাদা। আজকের এই চাঁদের আলো। রানা ভাবতে থাকে। আর আলাদা কাজলের আচরণ। রানা কেমন হতভম্ব হয়ে গেছে। এমন একটা অবাক করা অনুভূতি যে তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল কয়েক মুহূর্ত আগেও সে তা টের পায় নি।

কি যেন হয়ে যায় রানার। বুকের ভেতর একটা কাঁপুনি শিরশির করতে থাকে। ঘামতে থাকে হাতের চেটো। ভেতরে কোথাও জমে ওঠে উত্তাপ। রানা আবার সেই তেমনি অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে।

'নাও আর হাঁ করে সঙের মতো তাকিয়ে থাকতে হবে না—' কাজল অল্প সময়েই নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। একটু আগের লজ্জাবোধটা সে ঝেড়ে ফেলে। বলে ওঠে, 'চলো, এবার দুজনে একসঙ্গে গড়িয়ে পড়ব।'

'তোমার চোখে মুখে বালি ঢুকবে যে ?' রানা প্রসঙ্গ পেয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে।

'তোমায় তা ভাবতে হবে না— বালি আটকাবার কায়দা আমার জানা আছে।'

'কি আবার কায়দা ?'

'একটা রুমাল দিতে পারো ?'

'রুমাল কি হবে ?' রানা অবাক হয়।

'আছে কিনা বলো—তারপর দেখতেই পাবে।' কাজল উত্তর দেয়। তার চোখে মুখে অসহিষ্ণুতা।

'আছে, এই নাও।' রানা পকেট থেকে রুমাল বার করে কাজলের হাতে দেয়।

'বাঃ! ভারী সুন্দর তো রুমালটা।'

'হ্যাঁ, একেবারে নতুন।'

'তাহলে এটা ছিঁড়ব না। আমার কাছেই রেখে দেব।' কাজল দুহাতে চোখের সামনে রুমালটা দেখতে দেখতে জবাব দেয়। তারপর সেটা কোমরের শায়ায় গুঁজে রাখে।

রানার গয়ে তখনো কাজলের শাড়ি জড়ানো। হঠাৎ এক হ্যাঁচকা টানে শাড়ির খানিকটা কাজল ছিঁড়ে নেয়। আস্ত শাড়িটা ছিঁড়তে তার একটুও মায়া হয় না। ছেঁড়া টুকরোটা এবার সে নাকে মুখে জড়িয়ে বাঁধে। বলে, 'নাও, আমি তৈরি। ওয়ান-টু-থ্রী—'

রানাও তৈরি হয়ে পড়ে। কাজলের তিন গোনার সঙ্গে সঙ্গে এক সঙ্গে নিচের দিকে গড়াতে থাকে।

ভারী মজার সেই অবতরণ। প্রথমে রানা। আর তার পিছনে গড়িয়ে আসতে থাকে কাজল। তরতর করে দুরন্ত বেগে ওদের শরীর দুটো চটক পাহাড়ের চুড়ো থেকে ক্রমাগত পাক খেতে খেতে নিচের দিকে গড়িয়ে আসে। প্রথমে রানার দেহটা মাটি ছোঁয়। সমতলে এসেই তার গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরের ওপরে হুড়হুড় করে এসে পড়ে কাজলের দেহ। একটা ধাক্কা লাগে। নরম ধাক্কা। আর তৎক্ষণাৎ রানার বুকের ভেতর জমে ওঠা তাপটা বেড়ে যায়।

সামান্য সময়ের জন্য রানা কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে। তবে ওই

ভাবটাকে সে আমল দেয় না। তাড়াতাড়ি আবার হুড়্দাড় করে পাহাড়ের মাথায় ওঠে।

বারংবার একই খেলা চলতে থাকে। কোনোবার কাজল আগে। কোনোবার রানা। এই মজার স্লিপ খাওয়ার খেলা ওদের দুজনকে পেয়ে বসে। দুজনে দুজনের ঘাড়ে গড়িয়ে পড়ে। ভুলে যায় সময়ের হিসেব। বাড়ি ফেরার তাগাদা। সব কিছু ওরা ভুলে যায়। এমন সময় দূরে মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বেজে ওঠে। ওদের হুঁশ হয়।

চারপাশে তাকিয়ে ওরা দেখে রাত নামতে শুরু করেছে নিঃশব্দে। তাই চাঁদের আলো এখন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চারপাশের নির্জনতাকে মনে হচ্ছে আরো রমণীয়।

কাজলের হঠাৎ হুঁশ হয়। চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে সে কি যেন দেখে। মনে মনে একটা কিছু হিসেব করে। একটা ছড়ানো ভাবনাকে গুছিয়ে ধীরে ধীরে মনের গভীরে হাত রাখে। রানার মতো কাজলকেও একটা অনুভূতি ঘিরে ধরে। রানাকে এই মুহূর্তে, এই চন্দ্রাতপ-তলে দেখে তার ভারি সুন্দর লাগে। অন্য সময় রানার মুখে এমন অদ্ভুত এক ভাব সে দেখতে পায় নি। এ কি চাঁদের আলোর মায়া! নাকি নির্জনতার অবদান!

বালির পাহাড়ের ঢলটা ক্রমশ ঢালু হয়ে হয়ে সমুদ্র ছুঁয়েছে। সেখানের আলোর রঙ কিছুটা আবছা। যার ফলে কিছুটা রহস্য মাখানো। ওদের দুজনকে ঘিরে বালির পাহাড় জুড়ে ফুটে রয়েছে নির্জন জ্যোৎস্না। কাজল চোখ ফিরিয়ে চারপাশ দেখে ভাবল এমন চাঁদের আলোও তো সে আগে কোনো দিন দেখে নি। ভারি আশ্চর্য আলো! কেমন আতস কাচ যেন। যে আলোর ভেতর দিয়ে তাদের দুজনকে দেখতে বড় লাগছে।

অবাক হয়ে গেছে দুটি কিশোর কিশোরী। মুখ দিয়ে তাদের কোনো কথা বেরোচ্ছে না। অথচ ভেতরে ভেতরে যেন উপচে পড়তে চাইছে একটা কোলাহল। এই পৃথিবী তাদের চোখে নতুন। এখানে

কোনো কিছু ঢাকা নেই, সব খুলে গেছে কারো হাতের ছোঁয়ায়। তাদের দৃষ্টিও বুঝি খুলে গেছে। সেই অতীতে যে আবরণহীনতা ছিল তারই কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে কাজল আর রানা। আদিম প্রেরণার উৎসমুখও খুলে যাচ্ছে। যার ছোঁয়া এখনো ওদের ছুঁতে পারে নি।

পাহাড়ের এই উঁচু তল থেকে হয়তো এখুনি একজন গড়াতে গড়াতে ঢালু বেয়ে আর একজনের শরীরের ওপর ছুঁয়ে থেমে যাবে। ওখানেই আদিমতার শেষ। এর বাইরে অন্য কিছু বুঝবার মতো জমি তৈরি হয় নি।

'এই, এইবার শেষ কিন্তু—' কাজল যেন বোবা সময়কে হটাতে চাইল। তাই ফিরে এল চঞ্চলতায়। গড়িয়ে পড়ল চুড়ো থেকে। রানা ওর কথা শুনল। ওকে দেখে তখুনি ওর পিছন পিছন নিজের শরীরটাকে পাক খাইয়ে দিল।

দুজনে তীরবেগে নিচের দিকে নামতে লাগল। কাজল আগে এসে থামল। রানার শরীরটা হঠাৎ বাস ব্রেক করলে যেভাবে ঝাঁকুনি খায় ঠিক তেমন করেই কাজলের শরীরে ধাক্কা খেয়ে থেমে পড়ল। রানার বুকের ভেতর যেন কেউ একটা কলিং বেল চেপে ধরল। বিন-বিন করে নিঃশব্দ আওয়াজ ছড়িয়ে পড়তে লাগল মস্তিষ্কে।

শব্দটা অনুভূতি। ক্রমাগত তার বেগ বাড়ছে। হাত-পা কাঁপতে থাকে। রানার মনে হয় কাজলের ভেতরেও কি এমন হচ্ছে! কে জানে? ওকে বললে ও তো বিশ্বাস করবে না। ভারি অদ্ভুত ব্যাপার!

দুজনে উঠে বসল। আজকের মতো এই খেলা শেষ। ঘামে ভেজা দুটো মুখ। দুজনেই একে অপরকে দেখছে। রানা ভাবছে— ভেতরে এখনো সেই আওয়াজটা শিউরে শিউরে উঠছে। বোধ হয় কাজলেরও। বাইরে থেকে কিন্তু কাঠ বোকার মতো দেখাচ্ছে ওদের। কারো মুখে কোনো কথা নেই। খেলার পর কি করবে তাই কি ওরা

ভুলে গেল। রানার পা ওকে নিয়ে গেল কাজলের খুব কাছে। একেবারে দেহের ওপরে। কাজলের বুকের ঢিপঢিপ শব্দ তার কানে আসছে। গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে গরম নিশ্বাস।

রানার সারা শরীর ভিজে যাচ্ছে। হঠাৎ অস্বাভাবিক ঘামতে শুরু করল সে। কেমন একটা ভয়ের ঘেরাটোপ চারপাশে। চারদিক একবার দেখল সে। জনশূন্য এলাকা। ফাঁকা জায়গা জুড়ে সোনালি বালি চিকচিক করছে। দূরে সমুদ্রের সাদা ফেনার চেহারা মাঝে মাঝে ঝলসাচ্ছে। বাতাসের শব্দ যেন বেড়ে যাচ্ছে।

রানা নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তার কি হয়ে যায়। অচেতন হয়েই সে কাজলের মাথাটা নিজের দিকে টেনে নেয়।

'এই রানা, কি করছ! রানা রানা—' কাজল অস্ফুটে গোঙানোর মতো বলে ওঠে। তার গলার স্বরে মনে হয় সেও যেন ভয় পেয়েছে। এই জনশূন্য জায়গা অসহ্য হয়ে উঠেছে।

উত্তর দেওয়ার মতো মনের অবস্থা কোথায় উবে গেছে। রানা শুনতে পায় না কিছু। মনে হয় কাজলও তাকে শোনাবার জন্যে কিছু বলে নি। যা বলেছে তা ভয় কাটানোর জন্য কিংবা হতভম্ব ভাবটাকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টায়।

রানা ততক্ষণে ছু হাত দিয়ে কাজলের মাথা উপর দিকে তুলে ধরেছে। কাজল কিছু বোঝবার আগেই তার ঠোঁট ছুটোর ওপর অসম্ভব জোরে চেপে ধরেছে নিজের ঠোঁট। কাজল চোখ বুজে ফেলে। হয়তো ভয়েই অথবা অস্বাভাবিকতায়। তার ঠোঁট ছুটো ফাঁক হয়ে যায়। ফুলে ওঠে নাকের বাঁশি। রানা কাজলকে চুমু খায়। অনেকক্ষণ ধরে রানা ওর ঠোঁটের ওপর আক্রোশে ফেটে পড়ে।

প্রথম অবশ আর ভয় ভাবটা কাটিয়ে ওঠে কাজল। সে অদ্ভুত এক আস্বাদ পায়। অন্য এক খেলার স্বাদ বুঝি। তাই অনাবিল হেসে ওঠে শব্দহীন। আর পাল্টা চুমু খেতে থাকে রানাকে।

ধাতস্থ হলে দুজনে বুঝল কি যেন একটা ঘটে গেল তাদের মধ্যে। অথচ কি যে হল তা কেউ বুঝল না। শুধু ভাবল এ এক নতুন ধরনের খেলা। যা হঠাৎ মাথার ভেতর কেমন সবকিছু গোলমাল করে দেয়। ওদের জীবনের কাছে হয়তো বা এ এক নতুন আবিষ্কার।

এবার কিন্তু ভয়টাই জয়ী হয়। কাজল চমকে ওঠে। সে মনে মনে ভাবে, এখন রাত কত হল? এখানে ঘড়ি কোথায়! আকাশের দিকে তাকিয়ে কাজল বেশ বুঝতে পারে রাত এখন ঢের। বাড়ি ফেরবার কথা মনে পড়তেই একটু আগের ওই অস্বাভাবিক খেলার উত্তেজনাও সে ভুলে যায়। হাত পা হিম হয়ে আসে মা'র মুখটা মনে পড়তেই।

তাড়াতাড়ি ছেঁড়া শাড়িটা শরীরে জড়িয়ে নিয়ে কাঁপা গলায় কাজল বলে, 'রানা, শিগগির বাড়ি চল।'

রানার ঘোর তখনও কাটে নি। তাই সে বলে, 'কেন কি হল?' বাড়ি ফেরার ব্যাপারটা তার কাছে তখন খুব জরুরী মনে হয় না।

'মা আজ আমায় মেরেই ফেলবে।' কাজল প্রায় কেঁদে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গে রানারও মনে বড়মার মুখটা ফুটে ওঠে। হয়তো এতক্ষণে তিনি দারোয়ানকে দিয়ে রানাকে খুঁজতে পাঠিয়েছেন।

দুজনে হাঁটছে। কেউ কথা বলছে না। চারপাশের নীরব জ্যোৎস্নায় কেমন থমথমে ভাব। বেশ দ্রুতই দুজনে ফিরছে। মুখে কারোরই কোনো কথা নেই। মনের মধ্যে কি রকম একটা ভয় হঠাৎ চেপে বসছে। একটু আগেও এই ভয়টাকে এভাবে কেউ বুঝতে পারে নি।

তখন ছিল অন্য এক অনুভূতি। না জানা এক জগতের অদ্ভুত স্বাদ। কিভাবে আর কেমন করে যে ওরা সেখানে পৌঁছেছিল তা

বুঝতে পারে নি। সেই আস্বাদও ভুলিয়ে দিল ভয়। বিশেষ করে কাজল তার মা'র মারমুখী চেহারাটা বার বার দেখতে পাচ্ছে। কাজল চুপ করে থাকতে পারে না। ভয়টা কাটাতে চায়। তাড়াতাড়ি ঘাড় ঝাঁকিয়ে যেন নিজেকে শুনিয়েই বলে ওঠে, 'মারুক মা, যত খুশি মারুক—আমাকে মেরে ফেলুক, তাতেও ভয় পাই না।'

'তাহলে আর ভাবনা কি!' চলতে চলতে রানা উত্তর দেয়। সেও যেন এই ভাবনাই ভাবছিল।

'সে তোমার মাথায় ঢুকবে না।'

'তাই নাকি!' অবাক রানা। চলতে চলতে সে কাজলের মুখের দিকে তাকাল। একটু আগের উজ্জ্বল মুখটা এখন কালো থমথমে।

'মার খেতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু একটাই ভয় এখন—' কাজল বলল।

'কিসের ভয়?'

'ধর মা যদি কাল থেকে আমাকে আর না বেরোতে দেয়?'

'নাই বা দিল। তাতে কি আর হবে?'

'তুমি একদন বোকা।' কাজল একটু রেগে গিয়েই বলল, 'ভেবেছিলাম শহরের ছেলে, এত লেখাপড়া শিখছ, ঘটে বুদ্ধি আছে। এখন দেখছি উল্টো।'

'বুদ্ধি নেই বুঝলে কি করে?' রানা আহত হল কাজলের কথায়।

'বুঝতে কি আর বাকি আছে!' কাজল সপ্রতিভ হয়ে বলল, 'না বেরোতে দিলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি করে?'

'এই কথা—' রানা যেন নিশ্চিন্ত হল, 'না দিলেই হল নাকি।' একটু কি ভাবল, তারপর আবার বলল, 'দেখ সত্যি কথা বলে কোনো দিন আমি বড়মার কাছে মার খাই নি। তুমিও সত্যি কথা বলবে। একটু দোষ করলেই তোমার মা মারবেন এটাই বা কেমন

কথা।' রানা কাজলের ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে চায়। 'এটা তোমার মা'র ঠিক কাজ নয়।'

কাজলের চোখের জমি ভিজে ওঠে। মুক্তোর মতো টলটল করে দু ফোঁটা জল। রানা স্পষ্ট দেখতে পায়। কাজলের পাতলা ঠোঁট কাঁপতে থাকে। হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে রানার দুটো হাত ধরে বলে ওঠে, 'এই মা তো আমার মা নয়, টুটুলের মা।'

'কি বলছ পাগলের মতো!' রানা ওর হাতে ঝাঁকুনি লাগায়। 'তোমার কথার কোনো মাথামুণ্ডু নেই।'

'আমি ঠিকই বলছি রানা—' কাঁদো কাঁদো গলায় কাজল বলে, 'আমার নিজের মা অনেক দিন হলো মরে গেছে, এই যাকে দেখছ সে আমার সৎমা।'

এবার রানার কাছে বিষয়টা স্পষ্ট হয়। নিজের মা না থাকায় কাজল এত কষ্ট পাচ্ছে। তবু ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বলে, 'হোক না সৎমা, তাতে কি হয়েছে; আমার বড়মাও তো নিজের নয়—আমাকে মানুষ করছেন অথচ মা'র চেয়েও তিনি বেশি আমার কাছে।'

কাজল হাসে। অনেকটা অভিজ্ঞতার হাসি। যেন সে অভিজ্ঞ বলেই অনেক কিছু ধারণা করতে পারে যা রানার আয়ত্বের বাইরে। সে উত্তর দেয়, 'রানা, তোমার বড়মার নিজের কোনো বাচ্চা নেই তাই তুমিই সব—কিন্তু আমার মা'র সে বালাই নেই। বরং আমি সব সময় তার চোখের কাঁটা।'

রানার বোধগম্য হয়। সে তফাৎটা বুঝতে পারে। কাজলের জন্য তার ভীষণ কষ্ট হয়। মনে মনে বলে ওঠে, 'আহা বেচারা!' তারপর মুখে বলে, 'আরো একটু জোরে পা চালাও। এখনো অনেক দূর।'

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি চল।'

সেদিন রাতে কাজলের শাস্তি রানা নিজের চোখে দেখেছিল। দেখতে দেখতে কেঁদে ফেলেছিল সে। সত্যিই সে দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

ফিরতে অনেকটা রাত হয়ে গিয়েছিল।

রানার মনেও ভয় ছিল বড়মা তাকে বকবেন। রানা বড়মাকে সত্যি কথাই গড়গড় করে বলে দিল। সব শুনে বড়মা কিন্তু বকেন নি। শুধু বলেছেন, 'নতুন জায়গা—তুমি পথঘাট চেনো না, ছোট একটা মেয়ের সঙ্গে কি অতদূর যেতে হয়? দারোয়ানকে সঙ্গে নিলে পারতে। জানো তো এতক্ষণ আমি কি ভীষণ চিন্তা করছিলাম। বুকের মধ্যে সেই সন্ধ্যে থেকে কি যে হচ্ছিল তা তোমাকে বোঝাব কি করে?'

'আমার অন্যায় হয়ে গেছে বড়মা।' রানা মাথা নত করে।

বড়মা ওকে কাছে টেনে নেন। বুকের মধ্যে জড়িয়ে বলেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি একটুও রাগ করি নি। এখন যাও, ওপরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে জামা কাপড় পাল্টে ফেল। ইস্, কি বালি মেখেছ। ঘাড়ে গলায় কানের ভেতর বালি ঢুকে আছে।'

রানা তাড়াতাড়ি উপরে দৌড়ে যায়। তার মাথার ভেতর তখন কাজলের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। এতক্ষণে তার কি হল কে জানে। রানা পিছনের বারান্দায় পৌঁছতেই কাজলের মা'র তীব্র গলা শুনতে পেল। গলার সঙ্গে সমানে চলছে দুহাত। একনাগাড়ে গালাগালি দিচ্ছেন আর এলোপাথাড়ি কাজলকে মারছে।

কান্না মিশিয়ে কাজল তাকে যত বোঝাবার চেষ্টা করছে তত সে আরো খেপে উঠছে। এমন পশুর মতো অত্যাচার রানা এর আগে দেখে নি। তার কান্না পেয়ে যায়। চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে উঠতে, 'দোহাই, ওকে আর মারবেন না—' কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না।

রানা ঠিক এই রকমই আঁচ করেছিল।

এমন মারের কথা সে কল্পনাও করতে পারে নি। তার নিজের পর ভীষণ রাগ আর দুঃখ হতে লাগল, আগে সে কেন কাজলকে সাবধান করে নি। হঠাৎ চটক পাহাড়ের দৃশ্য মনে পড়ল। কাজলের বয়স হয়েছে—সত্যিই তো। এটাও ঠিক, এভাবে এত রাত করে কি তার বাড়ি ফেরা উচিত। চটক পাহাড়ে না গেলেই হত —তাহলে কাজল আর এভাবে মার খেত না। কিন্তু—

রানার চিন্তা বাধা পেল।

সে ভাবতে লাগল অন্য রকম। ওখানে না গেলে কি ওই অনুভূতি, ওই অদ্ভুত ভাল লাগার কথা তারা জানতে পারত। হঠাৎ মনে হল রানার, কাজল কি সুন্দর! ওর চুলগুলো কেমন ঝাঁকড়া আর ঘন—ঠোঁট দুটো পাতলা। আর—

আর ভাবতে পারল না রানা। অন্ধকার বারান্দায়ও মনে হল তার কান লাল হয়ে উঠেছে। গাল দুটো গরম। ছিঃ—রানা নিজেকেই বলল—ভাগ্যি কেউ জানে না এই কথা।

চিৎকার আর ঠেঙানি থেমেছে। কাজলও কাঁদছে না আর। অন্ধকারে রানা কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চাঁদের অদ্ভুত মায়াবী আলো থাকলেও তাদের বাড়িটার আড়ালের জন্য ওদের বাড়ির উঠোন ঢাকা পড়েছে।

রানা তখুনি ঘরে ফিরল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে তখনো লেগে রয়েছে চটক পাহাড়ের ছবি। সেই ভরা চাঁদ আর ঘাসে ভেজা কাজলের অপূর্ব মুখ। যতই সে কাজলের মুখটাকে ভাবতে লাগল ততই লজ্জা তাকে ঘিরে ধরল।

রানা এবার কাজলের এখনকার মুখখানা ভেবে নিল। মার খাওয়া যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখ। দুটো মুখ একটু একটু করে তার চেতনায় মিশে যেতে লাগল। তারপর এক সময় একাকার হয়ে গেল।

নিজের ঘরে এসে একটা বই তুলে নিল রানা। অ্যাডভেঞ্চারের বই। দু-এক পাতা পড়বার পর রানা আনমনা হয়ে পড়ল। বই

খোলা রইল চোখের সামনে। সে কিন্তু ভাবতে লাগল অন্য কথা।
কাজলের কথাই এসে পড়ল। রানা ভাবল। কি সাজ্ঘাতিক সহ্য করবার ক্ষমতা কাজলের! রানা বুঝতে চাইল এই ক্ষমতা কাজল পেল কোথা থেকে! পলকে তার মনে হল—আচ্ছা, সেই অদ্ভুত ভাল লাগা সুখটুকুই কি ওর মনে এমন শান্তি এনে দিয়েছে?

ঘর থেকেই আবার কাজলের মার গলা পাওয়া গেল। সে এখনো রাগ ভোলে নি। 'ইস্, শাড়িটা একেবারে ছিঁড়ে এনেছে মুখপুড়ি। বাপের যেন জমিদারি আছে। নিত্যি কত কাপড় যোগাবে শুনি। ধাড়ি মেয়ে! দিনরাত পাড়া মাথায় করে বেড়াচ্ছে আর এখনো সামলে কাপড় পরতে শিখল না। মাগো! কিভাবে ছিঁড়েছে একবার লোকে এসে দেখুক—আমি মিথ্যে বলি না সত্যি…'

রানার কানে এই চিৎকার ঢুকছে, সঙ্গে সঙ্গে শাড়ি ছেঁড়বার দৃশ্যটা মনে ভেসে উঠল। রানার নিজেকে অপরাধী মনে হল। তার জন্যেই কাজল আজ অপমানিত হচ্ছে।

কি যেন একটা কথা বলতে গেল কাজল। আসলে সে কিছু প্রতিবাদ করতে চাইল। আর তাতেই আগুনে ঘি পড়ল যেন। কাজলের মা আরো তেতে উঠল। এবার তার গলা চড়া পর্দায় বাজতে লাগল—'আবার মুখের ওপর কথা!' চটাস করে শব্দ হল। কাজলের মুখে চড় পড়ল। রানা সেই শব্দ শুনতে পেল। মনে হল যেন চড়টা তার গালেই পড়েছে। সে আর থাকতে পারল না। এক দৌড়ে বড়মার ঘরে চলে গেল।

বড়মাকে জড়িয়ে ধরে রানা বলল, 'বড়মা ওরা আজ কাজলকে মেরেই ফেলবে। সেই তখন থেকে কাজলের মা কি সাজ্ঘাতিকভাবে ওকে মেরে চলেছে।'

বড়মা তাড়াতাড়ি ওর মুখে নিজের একটা হাত চাপা দেন। বলেন, 'চুপ চুপ, চুপ কর—এ সব কথা এভাবে বলতে নেই।' তিনি রানাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরেন।

রানা বড়মার আশ্রয়েও কিছুতেই ওই অত্যাচারের ছবিটা ভুলতে পারে না। তার চোখের সামনে ছবিটা বহুক্ষণ একই ভাবে থাকে।

ভেতরে ভেতরে রাগ গুমরোতে থাকে। একটা কিছু করতে না পারার অপারগতা একটা অপরাধবোধ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে। সে খেতে পারে না ঠিক মতো। প্রায় না খেয়েই উঠে পড়ে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসতে চায় না। অনেকক্ষণ পর যখন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে তখনো ঘুমের মধ্যে শিউরে শিউরে ওঠে।

রানা যার জন্য এত ভাবছে সেই কাজল কিন্তু নির্বিকার। সে বহুদিন এমন মার হজম করেছে। মা'র সামনে থেকে সরে গিয়েই সে হাসে! এমন ঘটনাটাও তার কাছে হাসি বয়ে আনে। সে মনে মনে নিজেকে বলে, যাক বাবা, মারের ওপর দিয়েই চুকে গেল। তার ভেতরে যে ভয়টা ছিল তার কিছুই হল না। সুধামুখী খানিকটা গরল ঢেলে দিয়েই হাঁপিয়ে উঠল। সেই সঙ্গে হাতের সুখ করে নিয়ে এক সময় থেমে পড়ল।

কাজলের খুশি আর ধরে না! মার খেতে তো তার আপত্তি ছিল না। বাইরে বেরনো নিয়ে মা কিছুই বলে নি। সুতরাং সে আবার কালই রানার সঙ্গে দেখা করতে পারবে।

রানার সঙ্গে দেখা করার কথাতেই কাজল আনমনা হয়ে পড়ে।

রানা আজ কি রকম হয়ে গিয়েছিল যেন। ওকে কেমন বড় বড় দেখাচ্ছিল। ওর চোখ দুটোও বড়দের মতো। কাজল চটক পাহাড়ের কথা ভাবল।

রানার চুমু খাওয়া! ওকে জড়িয়ে ধরা! আঃ, কি মজা। কাজলের চোখ বুজে এল। তারপর কি যেন ভাবতেই লজ্জা পেল। নিজের বাড়িতে দৌড়ে কাজল নিজেকেই লুকোতে চাইল।

সুধামুখীর যতই দোষ থাক, একটা কিন্তু গুণ আছে। সে কখনো কাজলকে খেতে কষ্ট দেয় না। এর অবশ্য হয়তো একটা অন্য কারণও আছে। সুধামুখী এটা বোঝে কাজল ভুগলে তার ঘাড়েই সব

কাজের ভার পড়বে। তাই কাজলকে সুস্থ রাখার চেষ্টাই সে করে।

কাজলের পেটানো নিটোল স্বাস্থ্য। শরীরের অপূর্ব বাঁধুনি। তাই এত মারেও তার কোনো কষ্ট হয় না। একটু বাদেই দিব্যি সে ভুলে যায়।

কাজলের বাবা অন্য ধরনের। নিপাট ভাল মানুষ। কাজলকে খুব ভালবাসে। কাজলের মুখের মধ্যে সে যেন হারানো কিছু খুঁজে পায়। সুধামুখী কাজলকে মারে তা সে জানে। যদিও তার এতে খুবই আপত্তি। সুধামুখীকে বারংবার নিষেধ করে কাজলের গায়ে হাত দিতে। কিন্তু সুধামুখী সে কথা কানেই তোলে না। সে তার মনের জ্বালা মেটায়।

মারটা আজ হয়তো আরো কিছুক্ষণ চলতে পারত, কিন্তু কাজলের ভাগ্য ভাল তাই টুটুল ওই সময় চিৎকার করে ঘুম থেকে উঠে পড়ে। বাধ্য হয়ে টুটুলকে সামলাতে সুধামুখী কাজলকে ছেড়ে দেয়।

রাত্রের খাওয়া সেরে কাজল শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে আজকের পুরো ব্যাপারটা ভাবতে থাকে। তার চোখে ঘুম আসে না। ব্যথা বেদনা ভুলে সে সন্ধ্যার পর পর ছবি দেখে যায় চোখের সামনে। মনটা আনমনা হতে থাকে। মনটাকে ধরে রাখতে পারে না সে।

ওই ঘটনার পর দুটো দিন কেটে যায়।

দুটো দিন মানে চব্বিশ দুগুণে আটচল্লিশ ঘণ্টা। রানা কাজলের অপেক্ষা করে। ভাবে এই ও এসে পড়বে। কিন্তু কাজল আসে না। সেদিন রাতে বাড়ি ঢোকার পর থেকে রানা ওকে আর দেখে নি।

রানা ভাবে ওর কি হল? মারের চোটে কিছু ঘটল না তো? কিংবা ওর মা হয়তো ওকে বারণ করেছে আসতে। এই কথাটা মনে হতেই তার ভীষণ রাগ হয়। হঠাৎ মনে হয়, আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে কাজল লজ্জায় আসছে না। বাড়িতেই লুকিয়ে আছে।

রানা এ দুদিন কোথাও যায় নি। সমুদ্রস্নান করে নি। কাজলকে বাদ দিয়ে সমুদ্র পুরী আকাশ কিছুই ভাল লাগে নি। তাই কাজলের অপেক্ষায় ছটফট করে দিন কাটিয়েছে।

সারাদিন এভাবে বাড়িতে থাকায় বড়মা ভারি অবাক হন। যে ছেলে পুরীতে এসে কেবল টইটই করে ঘুরে বেড়িয়েছে সে কিনা এভাবে ঘরে বসে আছে! বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কি রে তোর কি হল? চান বেড়ান সব ছেড়ে দিলি যে বড়?'

'কিছু ভাল লাগছে না আমার।'

'ও মা! সে কি।' বড়মা তাড়াতাড়ি এসে গায়ে হাত দিয়ে বলেন, 'জ্বর জারি হল নাকি!' তারপর আশ্বস্ত হয়ে ওকে বলেন, 'বেড়াতে কেন ভাল লাগছে না?'

'এমনি।' রানা বেশি কথা না বলে বড়মার সামনে থেকে নিজেকে আড়াল করে। তার মনে হয় সামনে থাকলেই সে বুঝি ধরা পড়ে যাবে। বড়মা তার না বেরনোর আসল কারণটা বুঝে ফেলবে। এটা ভাবলেই লজ্জা লাগে। ভারি আশ্চর্য!

রানা ভেবে কূলকিনারা পায় না। সব যেন কেমন তেতো তেতো, বেস্বাদ। এক এক সময় সে উদাস হয়ে পড়ে। ভাবে, কাজল কি আর কোন দিনই আসবে না? কে জানে! এ প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে পায় না।

এদিকে দেখতে দেখতে দুটো দিন কেটে যায় রানার চিন্তা ভাবনার মধ্যে দিয়ে। কাজলের আচরণে অদ্ভুত একটা অসহযোগী মনোভাব। রানা অনেকবার ভেবেছে, একবার ওদের বাড়ি গিয়ে কাজলের খোঁজ নিলে কেমন হয়। পরমুহূর্তে তার মন বেঁকে দাঁড়ায়। নিজেই সে স্থির করে, এটা উচিত হবে না। এতদিন এসেছে তারা, একদিনও যায় নি। আজ হঠাৎ কাজল আসছে না বলে যাওয়াটা সন্দেহের চোখে দেখবে কাজলের মা। সে হয়তো তার সঙ্গে কাজলকে মিশতেই বারণ করেছে।

আসল ঘটনা আন্দাজ করা অসম্ভব। তবু মনে নানা ধরনের দুর্ভাবনা জমতে থাকে।

সেদিন দুপুরে বারান্দায় বসে রানা। বড়মা ঘুমোচ্ছেন। রানা তার পাশেই শুয়ে ছিল। চোখে ঘুম আসে নি। এমন কি গত দুটো রাতও সে ভালো ঘুমোতে পারে নি। কাজলের জন্য অজানা এক ভয়ে চিন্তায় চমকে চমকে ঘুম ভেঙে গেছে।

এখন বারান্দায় বসেও সেই কথাই সে ভাবছিল। আর তাহলে কাজলের সঙ্গে তার দেখা হচ্ছে না। মনটা খারাপ লাগে। সে এমন চায় নি। যে কটা দিন পুরীতে রয়েছে সে কটা দিন অন্তত ওর সঙ্গ নির্জনতা দূর করেছে।

বারান্দার কোণে ছায়া। সেই ছায়ায় বসে রানা রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের দরজার সোজাসুজি একটা টিউবওয়েল। দুপুর বলে লোকজন নেই। ফাঁকা কলতলা। এমন সময় হঠাৎ একজনকে দেখে রানার চোখ দুটো গোল হয়ে যায়।

নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারে না। ভুল দেখছে না তো! চোখ কচলে আবার তাকায় রানা। কোথায় ভুল! সে তো কাজলকেই দেখছে। একরাশ কাপড় নিয়ে সে কলতলায় এসেছে। রানার ভেতরে একটা খুশির ঢেউ ধাক্কা মারে। আনন্দে সে চীৎকার করে ওঠে, 'এই কাজল, কাজল—'

নিজের নাম শুনে কাজল মুখ ঘুরিয়ে বারান্দার দিকে তাকায়। রানাকে দেখতে পায়। মুখে কোনো কথা বলে না।

'আমি আসছি কাজল—' রানা আবার বলে। তারপরই তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। সিঁড়ি থেকে কয়েকটা লাফ মেরে সে কলটার কাছে চলে যায়। পাশে দাঁড়িয়েই ওর একটা হাত ধরে খুব জোরে ঝাঁকুনি দেয়। মুখে প্রশ্ন করে, 'কি ব্যাপার?'

কাজল হাত ছাড়িয়ে নেয়। চারপাশে একবার তাকায়। তারপর খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে, 'কি আবার!'

'দুদিন আসনি কেন? তোমার কি হয়েছিল?' রানার কণ্ঠে উত্তেজনা। 'আমি ভেবে ভেবে মরছি, তোমার কোনো অসুখ করে নি তো?'

'আমার অসুখ করে না।' কাজল হাসে। হাসিটা কেমন বিষণ্ণ দেখায়। 'যাদের মা নেই তাদের অসুখ করতে নেই।'

'তাহলে আস নি কেন?'

'এমনি।'

রানা ওর ঠাণ্ডা উত্তরে অপ্রতিভ হয়। মনে মনে ভাবে, কাজল তার ওপরে রাগ করে নি তো? 'এমনি হতে যাবে কেন—নিশ্চয়ই কারণ আছে।'

'তা হবে।' কাজল কাপড়গুলো কলতলায় নামায়। 'তুমিও তো একবার যেতে পারতে।'

'বিশ্বাস করো, প্রতি মুহূর্তে যেতে চেয়েছি, কিন্তু একটা লজ্জা আর ভয় আমাকে জোর করে থামিয়ে রেখেছে।' রানা যেন কথা গুলো বলে হালকা বোধ করে।

কাজল জবাব দেয় না। টিউবওয়েল পাম্প করতে এগিয়ে যায়। রানা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাতল ধরে। তুমি বালতি পাতো। আমি পাম্প করছি।'

'যা:, তুমি কেন করবে?'

'কি হয়েছে তাতে? আমি তোমার বন্ধু না—'

'তাই বলে...' কাজল চিন্তায় পড়ে। 'তুমি এত বড়লোকের ছেলে, তুমি পাম্প করলে—'

'শরীর ক্ষয়ে যাবে কি বলো?'

রানা হাতল চাপতে চাপতে বলে। কাজলকে দেখে সে খুশিতে টগবগ করছে।

'তা নয়—লোকে আমায় দুষবে।'

'লোকের কথা ছেড়ে দাও।' রানা হালকা হয়ে যায়। জোরে

জোরে পাম্প করতে থাকে। একটু বাদে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'বাইরের কলে কাচতে এসেছ কেন ?'

'বাড়ির কলটা খারাপ হয়ে গেছে তাই। নিজের কাপড় জামা না কাচলে মা বেরোতে দেবে না।'

'ও এবার বুঝেছি।' রানা উত্তর দেয়। 'তাই তুমি দুদিন বেরোও নি।'

'বাঃ, তোমার খুব বুদ্ধি তো!' একটু চুপ করে কাজল কাপড়ে সাবান ঘষে। বালতি ভরে গেছে। রানা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে থাকে। কাজল কি ভাবে। তারপর সাবান ঘষতে ঘষতে বলে, 'তুমি দুদিন চান করতে যাও নি কেন ?'

'আমার ইচ্ছে।' রানা অভিমানের সুরে বলে।

কাজল কোনো কথা বলে না। ঘাড় গুঁজে নিজের কাজ করতে থাকে। রানা কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। হঠাৎ বলে, 'কি—কথা বলবে না ?'

'কি বলব ?' কাজল চোখ তোলে।

'আমি চান করতে যাই নি তোমাকে কে বলল ?'

'আমি সব জানি।'

'ও—সব খোঁজ নেওয়া হয়েছে তাহলে ?'

'তুমি কি ভেবেছিলে আমি খোঁজ নেব না ?' এবার কাজল হাসে।

'তাহলে আস নি কেন ?' রানা জিজ্ঞেস করে।

'কেমন লজ্জা করছিল। যা তোমাকে বোঝাতে পারব না।'

'এখন করছে না ?'

'না,' কাজল আবার হাসল, 'তুমি লজ্জা ভেঙে দিয়েছ।'

'তুমি না এলে আমি আর সমুদ্রে চান করতে যাব না ঠিক করেছি।' রানা থামে, তারপর হঠাৎ কি মনে পড়ায় বলে, 'এই আমাদের বাড়ির কলে যাবে ?'

'কেন?'

'রাস্তায় বিশ্রী লাগছে। চল না। যত খুশি কাপড় কাচবে। গল্পও করা যাবে।'

কাজল ইতস্তত করে। রানা ওকে ছাড়ে না। প্রায় এক রকম ধরে নিয়ে আসে নিজেদের বাথরুমে।

ঠিক এই সময় বড়মা ঘুম থেকে উঠে আসেন। তিনি বাথরুমে কাজলকে কাপড় কাচতে দেখে অবাক হয়ে যান। রানা তাঁকে সব ঘটনা খুলে বলে। সব শুনে তিনি কাজলের হাত থেকে বালতিটা কেড়ে নেন। ঝিকে ডেকে তাকে কাচতে দিয়ে বলেন। 'তোমরা ওপরে গিয়ে গল্প করো।'

কাজল বড় বড় চোখ করে বড়মার দিকে তাকায়।

বড়মা হাসেন। 'যা দুজনে মিলে ওপরে যা। ঝি-র কাচা হয়ে গেলে ডেকে দেবে। ততক্ষণ গল্প কর বা গান শোন।'

রানা বলে ওঠে, 'খুব ভাল হল। চল, চল কাজল-বেশ কয়েকটা গান শুনতে পারবে।'

কাজলের কৌতূহলী চোখের সামনে একটা নতুন জগৎ যেন খুলে যায়। যে জগতের দরজা পেরিয়ে সে মন্ত্রমুগ্ধ। এমন সে আগে কখনো দেখে নি। কোনো দিন দেখবে ভাবেও নি।

এই বাড়ির সবকিছুই তাকে টেনে নিয়ে যায় কোথায় যেন। এই পরিবেশ আসবাব দেখে তার মনে হতে থাকে রাতদিন এখানে যদি সে থাকতে পারত। তাহলে কি ভালই না লাগত।

ছোট থেকেই এই বড় বাড়িকে বাইরে থেকে সে দেখে এসেছে। কোনোদিন ভাবে নি এর ভেতরে ঢুকতে পারবে। এতকাল তো এ বাড়ির জানালা দরজা বন্ধই পড়েছিল। তখন কে জানত এ একটা আলাদা জগৎ। হয়তো এমনি বন্ধ হয়েই থাকত বড়

বাড়ি। নেহাত রানারা আসায় আজ এর সব দরজা জানালা খোলা হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে রানার সঙ্গে ওপরে উঠল কাজল।

বাড়িটার সব কিছু সাজানো গোছানো। সিঁড়ির পর টানা বারান্দা। বারান্দায় পর পর ফুলের টব সাজানো। বিভিন্ন রঙে আলো হয়ে আছে বারান্দাটা। কত রকম ফুল: কত তার নাম। কাজল জীবনে দেখা তো দূরের কথা এই সব ফুলের নামই শোনে নি। হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। এত বড় বাড়িতে মাত্র ওই দুজন লোক! এত আসবাব সবই ওই দুজনের জন্য।

আগে রাতে বাড়িটাকে মনে হত ভূতুড়ে বাড়ি। আর এখন! ইস্ কত আলো! আলোয় ঝলমল করে। কাজল বুঝতে পারে এর থেকে, রানারা কত বড়লোক। ওদের কত পয়সা! বড়লোক কথাটা মনে হলেই কাজলের মনটা ভার হয়ে ওঠে। তাদের সঙ্গে রানাদের কত তফাত।

কিন্তু বড়মা বা রানা এই তফাতটা মুছে দিয়েছে। কাজল গরিব বলে তার মিশতে সামান্য অসুবিধে হয় নি। বরং মনে হয়েছে উল্টোটাই। রানার সঙ্গে তার কোনো তফাত নেই। এ বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র মনে হচ্ছে এখানে সে বড় আপনজন। বড়মার মতোই বড় মন পেয়েছে রানা। বড়মাব ভালবাসা সামান্যতেই বোঝা যায়। তাঁর কথায় মনে হয় তিনি রানার মতোই তাকে ভালবাসেন। খাদহীন স্নেহ। ভারি অদ্ভুত লাগে কাজলের। তার মা আর বড়মা—দুজনের মধ্যে কি ফারাক।

কাজলের কাছে সেদিন থেকে বড় বাড়ির দরজা খুলে যায়। প্রথম দিনের পর আর কোনো সঙ্কোচ মনে আসে নি। সারা দিন প্রায় কাজল রানাদের বাড়িতেই কাটিয়ে দেয়। ওদের দুজনের হৈ-

হুল্লোড় আর দুরন্তপনায় অন্নপূর্ণা অস্থির হয়ে ওঠেন। কিন্তু কখনই বিরক্ত হন না। কাজল যেন তার মা'র অভাব ভুলে যায় একজনের কদিনের আদর-যত্নে। সুধামুখী এ নিয়ে কাজলকে কিছু বলে না।

কাজলের দু' একদিন যাতায়াতের মধ্য দিয়েই অন্নপূর্ণার সঙ্গে সুধামুখীর আলাপ হয়েছে। অন্নপূর্ণা নিজে থেকেই সুধামুখীকে ডেকে বলেছেন, 'যতদিন না আপনাদের কল ঠিক হয় ততদিন এখান থেকেই জল নেবেন। কাচার জিনিস পাঠিয়ে দেবেন ওকে দিয়ে। ও তো আমার মেয়ের মত। ভারি মিষ্টি। সারাদিন ওর মুখে আপনার সুখ্যাত শুনি। খুব ভাল লাগে। ওর জন্যে ভাববেন না। খুব শান্ত ভাল মেয়ে আপনার।

নিজের প্রশংসা শুনে গলে যায় সুধামুখী। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'ওর কথা ছেড়ে দিন। ও একটা আস্ত পাগল। ওকে দিনরাত ধরে পিটি। তবু ওর পাগলামি যায় না। মারতে বাধ্য হই।' সুধামুখী নিজের সাফাই গায়।

'ঠিকই করেন, শাসন তো করতেই হবে—' সুধামুখীর কথায় সায় দেন অন্নপূর্ণা। 'শত হলেও মেয়ে, একটা কিছু খারাপ হলে লোকে আপনাকেই দুষবে।'

সুধামুখী ভীষণ খুশি হয়ে যায়। এই আলাপের পর থেকে সে আর কাজলকে বাধা দেয় না। কাজল নির্ভয়ে যতক্ষণ খুশি বড় বাড়িতেই কাটায়।

রোজই সে আসে। যখন তখন। এখান থেকে বাড়িতে জল পৌঁছে দেয়। কাপড় জামা কাচতে নিয়ে আসে। অন্নপূর্ণা পার্বতীকে দিয়ে তা কাচিয়ে দেন। সেই অবসরে রানা আর কাজল গল্প করে, হাসে, গান গায়।

রানার প্রতিটি জিনিসই অবাক করে দেয় কাজলকে। সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এক একটা জিনিস হাতে তুলে নেয়। নাড়াচাড়া করে। আবার সাবধানে রেখে দেয় জায়গা মতো।

গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে। সামান্য কোনো তুচ্ছ জিনিসকেও কাজল পবিত্র মনে করে।

তাই দেখে রানা হাসে। বলে ওঠে, 'তুমি কি ওগুলোকে ভয় পাও কাজল?'

'মানে?' কাজল চমকে যায়। সত্যিই সে ভয় পায়। রানা কিছু ভাবল নাতো!

রানার হাসি থামে না। 'মানে আবার কি—যেভাবে হাত দাও যেন একটা কিছু হয়ে যাবে এমন তোমার হাবভাব।'

এবার কাজল শব্দ না করে হেসে ফেলে। 'তা যা বলেছ, জানো আমার হাত দিতে খুব ইচ্ছে করে। হাত দিয়েই কিন্তু মনে হয় যদি নষ্ট হয়ে যায়।'

'বড়মা কি ভাববেন!'

'নষ্ট হলে কি হবে—আবার একটা কিনব।'

'বড়মা কিছুই ভাববেন না।' রানা নির্বিকল্পে বলে, 'আমি কত কত খেলনা ভেঙেছি। ঘড়ি, কলম, মাউথ অরগ্যান, বাঁশি।'

'বড়মা কিছু বলবেন না।'

'তবে না তো কি।' রানা কথা শেষ করে গ্রামোফোন বাজাতে বসে।

প্রতিদিন কিছুক্ষণ গ্রামাফোন বাজানো চাই। কাজলের গ্রামোফোন না শুনলে হবেই না। রানার যাবতীয় জিনিসের মধ্যে এই অদ্ভুত যন্ত্রটাকে সে সবচেয়ে বেশি ভালবেসে ফেলেছে। ওর ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসা গান কাজলকে মুগ্ধ করে দেয়। শুনতে শুনতে সে তন্ময় হয়ে পড়ে।

রানার খুব বেশি রেকর্ড নেই। তা না থাকুক। তাতে কাজলের কোনো কিছু যায় আসে না। একই গান সে বারংবার শুনতে ভালবাসে। ওর কাছে তা কখনোও পুরনো হয় না। এভাবেই ভারি মজায় কাজলের দিন কাটে।

প্রত্যেক দিন ভোরে কাজল চলে যায় সমুদ্রে। কাজল যখন সমুদ্রে যায় তখনো সূর্য ওঠে না। রানা সেই সময় ঘুমে অচেতন থাকে। তাই কাজল তাকে ডাকে না।

একাই চলে আসে সমুদ্র-পাড়ে। ওই সময় জেলেরা ও সামান্য কিছু স্বাস্থ্যান্বেষী ছাড়া বেলাভূমিতে মানুষ থাকে না।

কাজল একেবারে জলের ভেতর চলে যায়। সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন তার বুকের ভেতর ওঠাপড়া করে। ঢেউয়ের সঙ্গে ভাব করে সে। কথা বলে। তারপর ঢেউ ঘেঁটে ঘেঁটে নানান ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত ঝিনুক শাঁখ কুড়িয়ে আনে। যেমন তার রঙ তেমনি তার গড়ন। সমস্ত সংগ্রহ সে রানাকে দিয়ে দেয়। রানা খুশি হলেই তার চোখ উজ্জ্বল হয়।

আগে অন্য বন্ধুরা কত চাইত—কিন্তু কাজল প্রাণে ধরে এই সামগ্রী কাউকে দিত না। অথচ কি আশ্চর্য, তার যা কিছু জমানো ঐশ্বর্য সে সবই তুলে দেয় রানার হাতে। এতে কোনো কষ্ট হয় না। বরং বুকটা ভরে ওঠে।

রানাও তাকে অনেক কিছু দিয়েছে। নিজে থেকেই। কাজলকে চাইতে হয় নি। ভাল তাস। বড় বড় টফির বাক্স। ছবির অ্যালবাম। এইসব টুকিটাকি জিনিস। রঙের বাক্স। ছবি আঁকার কাগজ। রানার এ সব প্রচুর আছে। কলকাতায় ঘর ভর্তি পড়ে থাকে। কিন্তু কাজলের নেই, সাগ্রহে তাই সে এই উপহার গ্রহণ করে। রঙচঙে ঝলমলে এই জিনিসগুলো কাজলের ভারি পছন্দ। সবচেয়ে বেশি পছন্দ রানার একটা ছবি। ঘোড়ায় চেপে রানা। তাকে লাগছে বীরপুরুষের মতো। মাথা উঁচু করে তাকিয়ে আছে রানা। পরনে স্কাউটের পোশাক। এই ছবিটার দাম কাজলের কাছে প্রাণের চেয়েও বেশি। রানা প্রথম যেদিন কাজলকে ছবিটা দেখিয়েছিল, সেদিন কাজল দেখেই লাফিয়ে উঠেছিল। বলেছিল 'ওরে বাবা, তোমায় তো যোদ্ধার মতো লাগছে।

দেখে মনে হচ্ছে, যুদ্ধ করতে যাচ্ছ। এই পোশাকে তোমাকে খুব মানিয়েছে। ছবিটা আমাকে দেবে?'

'নাও না।' রানা ওর কথায় হেসে ফেলল।

'হাসছ যে বড়?'

'তোমার কথায়।' রানা উত্তর দিল, 'বেশ বলেছ, আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। তাহলে আমি নামসার্থক।'

'তা জানি না। যা মনে এল তাই বললাম।' কাজল ছবিটা খামের মধ্যে ঢুকিয়ে সযত্নে খামের মুখ বন্ধ করল।

কদিনের মধ্যেই কাজল গ্রামোফোন বাজাতে শিখে গেল। রানা রোজ গ্রামোফোনে ওকে রেকর্ড বাজিয়ে শোনায়। কাজলের হাত নিসপিস করে নিজে নিজে বাজাতে। কিন্তু কাজল তার ইচ্ছাকে জানতে দেয় না। রানাকে কোনোদিন বলে না। কাজলের মনে পড়ে যায় রানার সঙ্গে ভাব হওয়ার প্রথম দিনটি। সেইদিন সে কথা দিয়েছিল গ্রামোফোনে হাত দেবে না। সে কথা এখনো তার মনে আছে। সে কথা সে ভাঙতে পারে না।

কিন্তু রানা বোধ হয় ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনের কথা বুঝে নেয়। তাই হঠাৎ একদিন বাজাতে বাজাতে রানা বলে, 'এই কাজল, তুমি নিজে একটু বাজাও না।'

কাজলের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে ভাবতেই পারে না! তবু মুখে বলে, 'ওরে বাবা! ও আমি পারব না। তুমিই বাজাও।'

'কেন, না পারার কি আছে?'

'আমি তো জানি না।'

'এর আবার জানবার কি আছে।' রানা ওকে উৎসাহ দেবার জন্য ওর দিকে তাকায়। 'হাতল ঘুরিয়ে দম দেবে। তারপর রেকর্ডটা চালু করে ওর ওপর সাউণ্ড বাক্সটা বসাবে। ভারি তো হাতিঘোড়া কাজ! এখুনি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি।'

'শিখে কি লাভ ?'

'লাভ না হোক লোকসান তো নেই।' রানা একটু ভেবে বলল, 'তাছাড়া সব জিনিসই শিখে রাখা ভাল।'

কাজলের মৃদু আপত্তিতে সায় না দিয়ে রানা ওর ডান হাত টেনে নিয়ে সাউণ্ড-বক্স ধরিয়ে দেয়। তারপর সেটা কি করে বসাতে হয় রেকর্ডের ওপর তা দেখিয়ে দেয়। দম দেওয়াও শিখিয়ে দেয়।

কাজল খুশি হয়ে গান বাজাতে থাকে। এ যেন একটা পরম লাভ তার কাছে। ভেতরের ইচ্ছের পূর্ণ তৃপ্তি। ভেতরে আনন্দের এমন একটা আস্বাদ যা এর আগে কোনো দিন কাজল পায় নি।

কাজল বাজাচ্ছে। পাশে বসে রানা শুনছে। দুজনে গানের মধ্যে ডুবে আছে। এমন সময় বড়মা এসে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজল ভয় পেয়ে উঠে পড়ে।

'কি হল, উঠলে কেন ?' রানা প্রশ্ন করে। বড়মা ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

'বড়মা দেখলে বকবেন না ?' কাজলের চোখ করুণ।

'কেন ?'

'গ্রামোফোনে হাত দিয়েছি বলে।'

'দূর বোকা !' রানা হেসে ওঠে। 'বড়মা বকতে যাবেন কেন। এটা তো আমার। বড়মাই কিনে দিয়েছেন।'

'তাই বুঝি ?' কাজলের বিশ্বাস হতে চায় না।

'কেন, তোমাকে তো প্রথম দিনই বলেছিলাম, মনে নেই ?'

'ভুলে গেছি।' কাজল উত্তরটা দিয়ে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আমার মা হলে না—'

'তোমার মার কথা ছাড়—যতক্ষণ খুশি এখানে বসে তুমি বাজাও এ বাড়িতে কেউ তোমাকে কিছু বলবে না।'

কাজল আবার নিজের জায়গায় বসল। এক এক করে যতগুলো রেকর্ড ছিল সব বাজাল।

কাজল যেন একটা ঝড়। সমুদ্রের ঝড়ো বাতাস। সে অশান্ত সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই দুরন্ত। রানা তাকে শান্ত করেছে। থামিয়ে দিয়েছে। রানার কাছে যতক্ষণ সে থাকে ততক্ষণ শান্ত হয়েই থাকে। তার ভেতরের দুরন্তপনা কেমন ঘুমিয়ে যায়। কিন্তু একা হলেই সে মেতে ওঠে। ঝড়ের মতো দাপাদাপি করে বেড়ায়। সমুদ্রের বেলাভূমিকে মাতিয়ে রাখে কাজলের পায়ের শব্দ। এধার থেকে ওধার চরকির মতো ঘুরছে কাজল। সবাই ওকে দেখছে। একটা দমকা খুশির হাওয়া যেন সাগর পারের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

সবারই ভাল লাগে ওর এই চঞ্চলতার ছন্দ। ভাল লাগে কাজলের মিষ্টি চেহারা। তাই সবাই ওকে কাছে ডাকে। ওর চাঞ্চল্যে নিজেরা চঞ্চল হতে চায়। ওর সঙ্গে কথা বলে খুশি হয়। কয়েক মুহূর্তেই অচেনা লোকের সঙ্গে ও আপন হয়ে যায়। তাদের আত্মীয় হয়ে পড়ে। ভারি অদ্ভুত ওর স্বভাব। আপন মনে গান গায়। সকলকে গান শোনায়। ওকে দেখে মনে হয় চলাতেই ওর আনন্দ। থামলে ও বাঁচবে না। থামতে ও জানে না।

সকলের সঙ্গে গল্প করে। সবার কাছে বসে কাজল।

বাস ওইটুকুই। তাই বলে কেউই ওকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। এক ঠাঁই বসায় ওর বাধা আছে। হঠাৎ ও উঠে পড়ে। যেমন এসেছিল তেমনি হাওয়ার বেগে অন্য দিকে চলে যায়। কেউ কেউ পিছন থেকে ডাকে, 'এই, এই শোন না, আর একটু বস না—' সে ডাকের জবাবে উড়ে যেতে যেতে কাজল বলে, 'এখন নয়। ভীষণ তাড়া আমার। আবার পরে দেখা হবে।'

কিসের তাড়া কাজল তা জানে না।

এ তাড়া তার অন্তরের। তার স্বভাবের। যা তাকে সব সময় উড়িয়ে নিয়ে চলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে। সকলের স্নেহ মমতা যেন দু হাত ভরে তুলে নিতে চায় সে।

কাজলের বন্ধুরাও ওর সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। কাজল ঘুরছে লাট্টুর মতো। একবার এদিক। আবার পর মুহূর্তে ওদিক। এই গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে সমুদ্রের জলের দিকে তাকিয়ে, তারপরই লাফিয়ে উঠে সামনের দিকে ছুট লাগায়। মুখে বলে ওঠে, 'এই আমায় ধরতে পারে না।'

বন্ধুরা ওকে ধরবার চেষ্টা করে না। তারা জানে ওকে ধরা প্রায় অসম্ভব। রানা কিন্তু ছাড়ে না। কাজল মাঝে মাঝে রানার সঙ্গেও একই আচরণ করে। রানাও পিছন পিছন দৌড়য়। অবশ্য রানাকে ফেলে সে পালায় না। এই একজনের কাছে সে হার মানে। বশ্যতা স্বীকার করে। তার সমস্ত বন্যতা যেন রানার ছোঁয়ায় ধন্য হয়ে ওঠে। কাজল শান্ত হয়।

তবু কাজল স্বভাব ভোলে না। মাঝে মাঝে রানাকে চিন্তার মধ্যে ফেলে দেয়। কোনো দিন হঠাৎ সমুদ্রের পারে বেড়াতে বেড়াতে কাজল দৌড় দেয়। রানাও দ্রুত ছুটে আসে। কাজল হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে সে সামনের অশান্ত জলের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তরতর করে চলে যায় অনেকটা দূরে। রানা ভয় পায়। এক এক সময় তার হাত-পা কাঁপতে থাকে। শেষে একটা বিপদ বাধিয়ে বসবে না তো কাজল। সে একদম কিনারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকতে থাকে, 'এই কাজল, এই কি হচ্ছে!'

কাজল ওর কথায় গ্রাহ্য করে না। মাছের মতো জলের মধ্যে হাত পা ছুঁড়তে থাকে। রানা তীর ধরে ধরে ওর দিকে লক্ষ্য রাখে। মাঝে মাঝে কাজল, এই কাজল, বলে ডাকতে থাকে।

নীল জলের ওপর সূর্যের আলো ভাসতে থাকে। কাজল সেই সঙ্গে ভেসে বেড়ায়। যেমন পাখি ডানা মেলে আকাশে মুক্তি খোঁজে। রানা রেগে যায়। ভয় পায়। কাজলকে বকুনি লাগায়। এক একবার বিরাট একেকটা ঢেউয়ের আড়ালে কাজল হারিয়ে যায়। রানা ব্যস্ত হয়ে ওকে খুঁজতে থাকে।

রানা টের পায় না কাজল কখন জল থেকে উঠে পড়েছে। হঠাৎ ওর পিছনে দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হাসতে থাকে। রানাকে এভাবে ভাবিয়ে তুলতে ওর ভাল লাগে। ওর সারা শরীর বেয়ে ঝরতে থাকে জল। কিছু কিছু মুক্তোর মতো জলের ফোঁটা মাটিতে ঝরে। কাজলের চেহারাটা তখন ভারী অদ্ভুত লাগে রানার কাছে। রানার হঠাৎ মনে হয় কাজল বুঝি জলপরী।

পরমুহূর্তে রানা রেগে যায়।

কাজলের ওপর ভীষণ রাগ হয়। রেগেই ওকে বলে, 'তুমি ভীষণ অবাধ্য মেয়ে! একটা জলের পোকা! দেখবে একদিন জলে ডুবেই মরবে। দেখো কেউ বাঁচাতে আসবে না।'

'কেন—তুমি ?' কাজল হালকা গলায় উত্তর দেয়।

'আমি তো সাঁতারই জানি না।' রানা বলে ওঠে, 'তাছাড়া আমি তোমার সঙ্গে আর সমুদ্রে আসবই না।'

'কেন ?'

'কেন!' রানা চোখে রাগ ফুটিয়ে তাকায়। 'তুমি অপঘাতে মরবে আর আমি তার দায়ী হব!'

'ভালই হবে।' কাজলের তাপ-উত্তাপ নেই। রানার রাগে তার খুব মজা লাগে। 'শুনেছি অপঘাতে মরলে মানুষ ভূত-পেত্নী হয়। আমিও পেত্নী হব। তারপর যাকে ইচ্ছে তার ঘাড়ে চাপব।'

'চেপে দেখ না একবার।'

'কি করবে ? তখন তো তুমি আমায় ধরতে পারবে না।'

'খুব হয়েছে। এবার বাড়ি চল।'

দুজনে বাড়ির পথ ধরে। ভিজে কাপড়ে কাজল ওর সঙ্গে হাঁটে। সপসপ একটা শব্দ হয়।

'আচ্ছা, তোমার কি একটুও ভয় নেই ?' রানার রাগ পড়ে যায়। সে শান্ত গলায় কাজলকে জিজ্ঞেস করে।

'না।' সহজ জবাব কাজলের। 'আমি ভয় কাকে বলে জানি না। এও বুঝি না, মানুষ ভয় পায় কেন?'

'তুমি একটা দস্যি, তাই বুঝতে পারো না।'

রানাও কাজলকে বুঝতে পারে না। সে ভেবে ভেবে খেই পায় না। একটা মেয়ে কি করে এমন দুরন্ত হতে পারে। শুধু এটুকু বোঝে, কাজল আর দশটা মেয়ের মতো না। অন্য কোনো ধাতু দিয়ে গড়া।

পরীক্ষাব পর রানারা পুরী এসেছিল। তখন গ্রীষ্মকাল। চারপাশের প্রকৃতি ছিল রুক্ষ। শুকনো হাওয়ার প্রভাব। এখন গরম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বর্ষা আসন্ন। যদিও পুরীতে গরম বা বর্ষার প্রাক মুহূর্তে আলাদা কোনো আবহাওয়া টের পাওয়া যায় না। যা কিছু পরিবর্তন আকাশের পটভূমিতে। সেখানে মেঘের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়।

প্রতিটি ঋতু-মাফিক মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে। এটাই নিয়ম। যেমন নিয়ম করে ঋতু আসে যায়। পৃথিবী ঘোরে তার সেই পুরনো পথ ধরে। নিয়ম করেই একদল সামুদ্রিক পাখি এসে পড়ে। তারা কলরব করে কিছু দিন। আবার সময় ফুরোলেই চলে যায়।

পুরীতে এভাবেই যাত্রীরা আসে যায়। কখনো বেশি, কখনো খুব কম। একদল যাত্রীর জায়গা পূর্ণ করে অন্যদল। একের বদলে আর। শূন্যতা তো কোথাও থাকতে পারে না। এও বোধ হয় তেমন। কিন্তু কাজলের কোনো পরিবর্তন নেই। বাড়ি আর সমুদ্র। সমুদ্রের জল ঢেউ আর অবাধ হাওয়া। শুধু যা বদল হয় তা বয়সের, চেহারার। তা বাদে সব কিছু একটা ছকে বাঁধা। বালি নিয়ে খেলা, ঝিনুক কুড়োন না হলে ঢেউয়ের মাথায় দাপাদাপি। কাজল

এ ব্যাপারে কখনো হাঁফায় না। বা তার কাছে একঘেয়ে হয়ে ওঠে না এই জীবন।

এরই ফাঁকে ফাঁকে নতুন নতুন মানুষ আসে। নতুন মুখ। তারা কাজলকে ছুঁয়ে যায়। জলের বুকে দাগ যেমন থাকে না তেমনি কাজল কাউকেই মনে রাখে না। কতগুলো এলোমেলো নাম কখনো উঠে আসে মনে। তারপরই হারিয়ে যায়। সমবয়সী অনেকে তার বন্ধু হয়। তাদের মা-বাবারাও কাজলের কাছাকাছি এসে পড়ে। কাজলকে সকলের ভাল লাগে। আবার সকলকেই কাজল ভালবাসে। তাদের সঙ্গে চুটিয়ে আলাপ হয়। ওঠা বসা। কত রকম খেলা। নতুন নতুন মজা।

যতদিন তারা ছিল ততদিনই। যেই তারা চলে গেছে কাজল তাদের মনে রাখে নি। কাজল জানে ওরা কেউ ফিরে আসবে না। বা ফিরলেও কাজলকে মনে করে রাখবে না। কাজলের—তার মনের গভীরে যে স্মৃতির জাদুঘর, সেখানে সবাইকে সযত্নে রেখে দিয়েছে। এত গভীরে, যে বাইরে কাউকেই ধরে রাখে নি।

কাজল তার এই মজার জগৎ নিয়েই আছে। নতুন নতুন আলাপ। নতুন একদল সমুদ্রাভিলাষী মানুষ। সেই সঙ্গে সীমাহীন সমুদ্র আর অফুরন্ত ঢেউ। কাজলের জীবনে মূল্যবান কোনো সংগ্রহ নেই। অথচ এ সবই যে অমূল্য তা কাজল বোঝে না।

এভাবেই বড় হয়েছে কাজল। বেড়ে উঠেছে অদ্ভুত এক প্রাকৃতিক আকর্ষণকে আঁকড়ে ধরে। হয়তো তার জীবন এমন করেই বয়ে যেত যদি না রানার সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে যেত।

রানা এক অদ্ভুত জগতের খবর নিয়ে এসেছে যেন তার কাছে। যে জগতে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। উজাড় করে রানা তাকে কত কি দিয়ে যাচ্ছে। কাজল কোনো দিন ভাবে নি এ কথা। দিনগুলো যে তাকে এমন কানায় কানায় ভরিয়ে তুলবে তা তো কল্পনার বাইরে।

যত পাচ্ছে কাজল তত অবাক হচ্ছে। আপন মনে সে শুধু ভাবে, একজন এত দিতে পারে। কাজল যত পাচ্ছে হাত ভরে তত নিচ্ছে। কিন্তু সে একবারও ভাবছে না, এ দেওয়া একদিন শেষ হবে—রানারা চলে যাবে ছুটি ফুরোলেই।

মেলামেশার প্রথম দিকে কাজল জানতে চেয়েছে; রানারা কবে ফিরে যাবে, কত দিন থাকবে এ সব কথা। রানা প্রতিবারই উত্তর দিয়েছে, ফিরবাব দেরী আছে। পরীক্ষার ফল না বেরনো পর্যন্ত তারা থাকবে।

পরীক্ষার ফল কবে বেরোবে এ নিয়ে কাজলের মাথা ব্যথা নেই। লেখাপড়ার ব্যাপারে তার উৎসাহ একদম নেই। ফলে কাজল ভুলেই গেছে রানাদের ফেরবার কথা। রানাই যেন তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। কাজল এখন রানা ছাড়া আর কিছুই মনে রাখে না। আগে ছিল সমুদ্র আর এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রানা।

এভাবে একটানা আড়াই মাস দেখতে দেখতে এক সময় শেষ হয়ে গেল। পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় নিয়মের মতো এবার রানাদের ফিরবার দিন কাছে চলে এল। একদিন সকালে কলকাতা থেকে জেঠুর চিঠি এল, কয়েকদিনের মধ্যেই পরীক্ষার খবর বেরিয়ে যাবে—তার মানেই রানাকে ফিরতে হবে।

শুধু ফিরতে হবে না—ফেরবার মোটামুটি একটা দিনও ঠিক করে জেঠু লিখে পাঠিয়েছেন। মধ্যে আর কটা মাত্র দিন। বড়মা এখানে সংসার গুছিয়ে বসেছিলেন একটু করে। এবার তাঁর গোটাবার পালা। বড়মা গোছগাছ শুরু করে দিলেন চিঠি পেয়েই। তিনি পুরীর বাজার ঝেঁটিয়ে জিনিস কিনতে শুরু করলেন। যা যা পাওয়া যায় এখানে তার সবই দরকার। সবাইকে দিতে হবে। না হলে তারা কি বলবে। যেন বড়মা না দিলে তাদের ভীষণ কষ্ট হবে।

বিকেলবেলা রানা আর কাজল প্রতিদিনের মতো বেলাভূমিতে বেড়িয়ে বেড়ায়। রোজকার মতো গল্প করতে থাকে এটা সেটা।

হঠাৎ কি মনের পড়ায় রানা বলে উঠল, 'আরে কাজল, তোমাকে একটা কথা বলা হয় নি—'

'কি কথা?' কাজল কৌতূহল নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল।

'জেঠুর চিঠি এসেছে—' রানা একটু থেমে থেমে বলল, দু'এক দিনের মধ্যেই আমরা কলকাতা ফিরে যাব।'

কথাটা শুনেই কাজল স্তব্ধ হয়ে গেল। কেউ যেন তাকে আকাশ থেকে আছড়ে মাটিতে ফেলে দিল। বুকের ভেতর একটা ঠাণ্ডা হাওয়া কিভাবে বয়ে গেল। রানাদের ফিরে যাওয়ার কথাটা তো ভুলেই গিয়েছিল। তাই খবরটা তাকে বিমূঢ় করে তুলল। তার মুখ থেকে মুহূর্তে কেউ যেন রক্ত শুষে নিয়েছে। কাজল ফ্যালফ্যাল করে রানার দিকে তাকাল। তার পাতলা ঠোঁট দুটো কাঁপছে থরথর করে।

রানা এমন ভাবে নি। তার মনে হয় নি অজান্তে কি সাংঘাতিক বোমা সে ফাটিয়েছে। ভয় পেয়ে গেল রানা। থেমে পড়ে হঠাৎ দু হাত বাড়িয়ে কাজলকে ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, 'এই কাজল, কি হল তোমার?'

'কিছু না।' ধরা গলায় কাজল উত্তর দিয়ে মাথা নামিয়ে নিল।

'চুপ করে গেলে যে?'

কাজল হাঁটতে লাগল আস্তে আস্তে। কয়েক পা এগিয়ে গেল বালি মাড়িয়ে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার পা-ও যেন চলতে চাইছে না।

'কি লাভ আর কথা বলে—' কাজল বিড়বিড় করে উঠল, 'আর তো মাত্র দু-এক দিন—তারপর তুমি তো চলেই যাবে।'

'মন খারাপ হয়ে গেল বুঝি?' রানা হাঁটতে হাঁটতেই কাজলের একটা হাত ধরল।

'না।' কাজলের গলা কঠিন শোনাল। কিন্তু তার দুটো চোখের জমিই ভিজে উঠল। তাড়াতাড়ি নিজের হাত ছাড়িয়ে কাজল কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছল।

'কি ছেলেমানুষী করছ!' রানা আবেগ নিয়ে বলল, 'আমাকে পড়তে হবে না? লেখাপড়া শিখে বড় হতে হবে না?'

কাজল উত্তর দিল না।

উত্তর দিতে তার ইচ্ছে করল না। সে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। সামনেই একটা উঁচু বালির ঢিবি। কাজল সেই ঢিবিটায় ঠেস দিয়ে বসে পড়ল। তাকে দেখে মনে হল সমস্ত চঞ্চলতা যেন তার ভেতর থেকে উবে গেছে।

রানা এসে পড়ল। সেও পাশে বসল। দুজনের মধ্যে যেন হঠাৎ একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। সময় গড়াচ্ছে। অথচ কথা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভারী অদ্ভুত একটা পরিস্থিতি।

রানাই আবার কথা বলল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলে?'

'ভাল লাগছে না।'

'কেন?'

'তা জানি না।' কাজল আকাশের দিকে তাকাল।

'দু-দিন বাদে তো চলেই যাব—' রানা এবার আস্তে আস্তে ধরা গলায় বলতে লাগল, 'তার আগেই এ ভাবে তুমি কথা বন্ধ করলে?'

'চলে যাবে বলেই তো চুপ করেছি—কথা বাড়িয়ে কি হবে?'

'তুমি রাগ করেছ?'

'রাগ করব কার ওপর?' কাজল হঠাৎ বয়সী মেয়েদের মতো বলে উঠল, 'আর আমার রাগে তোমার কি হবে?'

'অনেক কিছুই হবে।' রানা বিরক্ত হয়ে উঠল। 'লেখাপড়া হবে না। মানুষ হতে পারব না।'

'কেন?'

'কেন আবার—' রানা বলতে লাগল, 'তুমি এই যে দুঃখ দিচ্ছ, কষ্ট দিচ্ছ, এটাই মনে থাকবে আর আমার সব কিছু খারাপ হয়ে যাবে।'

'যাঃ!' কাজল চমকে উঠল। 'তাই হয় নাকি!'

'হয়—দেখ আমার কথা সত্যি কিনা।'

'না গো, আমি রাগ করিনি—' কাজল ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'এতদিন বাদে চলে যাবে তাই শুনে হঠাৎ খুব খারাপ লাগল। আচ্ছা, তুমি আবার কবে আসবে?'

'দেশে ফিরব পাঁচ বছর বাদে—আমি তো বিদেশ চলে যাব পড়তে।'

'পাঁচ বছর!' কাজলের অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। এমন হয়ে গিয়েছিল পাঁচ ঘণ্টা রানাকে না দেখলে অস্থির হয়ে যেত, সেখানে পাঁচ বছর। কাজল ভাবতে লাগল। পাঁচ বছরে রানা কত বদলে যাবে, তখন কি তার আব তার মতো লেখাপড়া না জানা মেয়েকে মনে থাকবে? কে জানে!

'আচ্ছা রানা, আমার কথা তোমার মনে থাকবে?'

'বা রে, মনে থাকবে না? বলছ কি, নিশ্চয়ই মনে থাকবে!' রানা জোর দিয়ে বলে উঠল।

কাজল ওর কথা শুনল কিনা বোঝা গেল না। তার কি যেন হয়েছে। সে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। আকাশে কটা পাখি হঠাৎ খুব দ্রুত উড়ছে, পাক খাচ্ছে। কাজল সেদিকে তাকিয়ে একটু বাদেই বলে উঠল, 'আজ হয়তো ঝড় উঠবে।'

'ঝড়!' রানার ঝড়ের নামে ভীষণ ভয়।

ঝড়ের কথায় ওর একদিনের ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়।

কথাটা মনে পড়তেই ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সেদিনও ঝড় উঠেছিল। আচমকা ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওদের ওপর। সেদিন রানাকে নিয়ে কাজল চক্রতীর্থে গিয়েছিল। গল্পে মশগুল কাজল আন্দাজ করতেই পারে নি ঝড় উঠতে পারে। সারা সময়টা ভালয় ভালয় কাটল। ফেরবার সময় শুরু হল হাওয়ার দাপাদাপি।

হাওয়া ছাড়বার আগে প্রকৃতি একেবারে নিস্তব্ধ হয়েছিল। তাই দেখে কাজল খানিকটা আঁচ করেছিল। তাই সে দ্রুতই পা চালিয়েছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

খানিকটা যেতেই বাতাসটা লাফিয়ে যেন ওদের ঘাড়ে চাপল। সে কি দুরন্ত বাতাস! হাওয়ার সঙ্গে ছুটে আসছে বালির কণা। দুজনকে চারপাশ থেকে এলোমেলো হাওয়া চেপে ধরেছে। পালাবার পথ নেই। চারপাশ অন্ধকার উড়ন্ত ধুলো আর বালিতে।

রানা জীবনে এমন দৃশ্য দেখে নি। সে দিশেহারা হয়ে পড়ল। ভয়ে তার হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। কি করবে বুঝতে না পেরে সে দু হাতে কাজলকে আঁকড়ে ধরল। কাজল কিছুটা পথ ওকে নিয়ে ওভাবেই গেল। কিন্তু যখন বুঝল হাওয়ার বেগ আরো বাড়বে তখন সে বিহ্বল রানাকে এক ধাক্কায় বালির ওপর ফেলে দিল।

ক্লান্ত অবসন্ন রানা কিছুই বুঝতে পারল না। সে উঠতে চেষ্টা করে বারবার। যতবার সে উঠতে যায় ততবার কাজল তাকে ফেলে দেয়। তারপর যাতে না রানা উঠতে পারে তার জন্য উপুড় হয়ে রানার শরীরের ওপর শুয়ে পড়ে। যেন কোনো অভিজ্ঞ পাখি সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে তার ছানাকে আগলে রাখছে। রানাকে কিছু বুঝতে দিচ্ছে না।

ওদের শরীরের ওপর দিয়ে তীব্র বেগে বালুকণা ছুটতে থাকে। লক্ষ লক্ষ ছুঁচ যেন ছুটে আসছে দুজনকে বিদ্ধ করতে। সেই সঙ্গে হাওয়ার প্রচণ্ড গতি। প্রকৃতি কেঁপে ওঠে মাতাল হয়ে। রানা টের পায় না সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা। সে পরম এক নির্ভরতায় কাজলের বুকের নিচে পড়ে থাকে। সেই উষ্ণ সান্নিধ্যে সে তার হারানো সাহস ফিরে পায়।

কাজলের পিঠের ওপর অজস্র বালির কণা তীরের ফলার মতো বিঁধতে থাকে। কাজল দাঁতে দাঁত চেপে সেই আঘাত সহ্য করে।

নিজের কষ্টের প্রতি তার খেয়াল নেই। সে শুধু রানাকে বাঁচাতে চায় এই অসহনীয় দুর্যোগ থেকে।

সামান্য সময়ে সারা আকাশ কালো হয়ে যায়।

সেইদিকে তাকিয়ে কাজল এবার নিশ্চিন্ত হয়। কোথা থেকে দল বেঁধে মেঘেরা ভিড় করে। ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি নামে। বৃষ্টিতে ওরা ভিজতে থাকে নিরুপায় হয়ে। দুজনে স্নান করে অঝোর ধারায়।

বহুক্ষণ বাদে ঝড় থামে। আকাশ আবার ফরসা হয়। কাজল হাঁপ ছাড়ে। কখনো কখনো ঝড় একটানা দু দিন হতে পারে। কাজল উঠে দাঁড়ায়। দিশেহারা রানাও উঠে বসে। রানার দিকে তাকিয়ে হাসে কাজল। মধুর সেই হাসি। মনে মনে ভাবে, যাক, এ যাত্রায় রানাকে বাঁচাতে পেরেছি। আবার দুজনে বাড়ির রাস্তা ধরে। চলতে চলতে রানা বলে, 'উঃ, আমার যা ভয় করছিল!'

'কেন?' কাজল প্রশ্ন করে।

'ভয় করবে না!' রানা অবাক হয়।

'এর আগে কোনো দিন ঝড় দেখ নি?'

'দেখেছি।' রানা উত্তর দেয়। 'তবে সে শহুরে ঝড়। এমন ভয়ঙ্কর সমুদ্রের ঝড় নয়। বালি নয় তো যেন ছুঁচ।'

'তুমি একা থাকলে ভাবতে পারছি না কি হয়ে যেত—' কাজল আস্তে আস্তে বলল, 'এখানকার লোক ছাড়া এ রকম ঝড়ে পড়লে অনেকেরই বিপদ হয়ে যায়।'

'ঠিক বলেছ। আমার তো এখনো মাথায় আসছে না তুমি কেন আমাকে বারবার ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলছিলে? ভয়ে তখন আমি কাঁপছিলাম।'

'তুমি জানো না রানা, ঝড় উঠলে সমুদ্র মানুষকে টানতে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুতেই রেহাই নেই। ঝড় তোমার ঘাড় ধরে সমুদ্রে নিয়ে ফেলবে। একমাত্র বাঁচার উপায় হল শুয়ে পড়া।

মুখে কথা বলতে পারছি না। বালি ঢুকে যাবে। তাই ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলছিলাম। বারবার উঠে পড়ছ দেখে চেপে ধরেছিলাম। তোমার কোথাও লাগে নি তো রানা?'

'না না। কোথাও লাগে নি।' রানা বলে উঠল, 'এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।' হঠাৎ কি মনে হওয়ায় রানা বলে উঠল, 'কাজল যাই বলো, ওই ভয়ের মধ্যেও আমার না ভীষণ ভাল লাগছিল।'

'ধ্যেৎ, তুমি ভারী অসভ্য!' কাজলের কান গরম হয়ে উঠল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

রানার নতুন করে চক্রতীর্থের কথা মনে পড়ল। ভিজে সপসপে গায়ে ওরা সেদিন বাড়ি ফিরেছিল।

ওই ঘটনার কথা রানা ভোলে নি। তাই ঝড়ের নাম শুনলেই আঁতকে ওঠে।

হঠাৎ রানার কি মনে পড়ে।

সে তার ডান হাতের কনুইর ওপরে বাঁ হাত দিয়ে স্বস্তি অনুভব করে। একটা মাদুলি। কাজলের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকায় রানা। তার এই মুহূর্তে মনে হয়, চঞ্চল ডানপিটে এই মেয়েটা বোধ হয় নিজের জীবনের চেয়ে তাকে ভালবাসে। মনে পড়ে যায় মাদুলির ঘটনাটা!

ওই ঝড়ে পড়ার দিন দুই বাদে কাজল একদিন এসেই তাকে বলে, 'কই, তোমার ডান হাতটা তোল তো?'

'কেন?' বলে রানা ওর দিকে তাকাল। দেখতে পেল লাল সুতোয় বাঁধা চকচকে একটা মাদুলি।

'এই মাদুলিটা পরিয়ে দেব।'

'কি হবে মাদুলি পরে? কিসের মাদুলি?' রানা অবাক হয়ে যায়।

'বুড়োবাবার—' কাজল ততক্ষণে ওর হাতে মাদুলি বাঁধতে শুরু করে। 'তোমার জন্যে করে নিয়ে এসেছি। এটা সঙ্গে থাকলে জলে-ডাঙায় তোমার আর কোনো বিপদ হবে না।'

'ভারী অদ্ভুত তো' রানা হাতের বাঁধা মাদুলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা মাদুলির এত জোর!'

বড়মাও দেখেছেন। সব শুনে তিনি খুশিই হয়েছেন। কাজলকে আর বড়মাকে খুশি করবার জন্যই রানা হাত থেকে খুলে ফেলে নি।

এখন ঝড়ের নাম শুনেই মাদুলির কথা স্মরণ হল। এখন তার ধারণা হল বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ—কাজলের বলা শেষ কথাটা যেন নতুন করে তার কানে বাজল। 'যতদিন না নিজে থেকে এই মাদুলি খুলে পড়ে না যায় ততদিন এটা পরে থাকবে।'

কাজলের হাসি পেয়েছিল কথাটা শুনে। সে উত্তর দিয়েছিল 'এমনি এমনি আবার মাদুলি হারায় নাকি?'

'যায় না?' রানা বড় বড় চোখ করে কাজলের দিকে তাকিয়েছিল 'কত জিনিসই তো আপনা আপনি হারিয়ে যাচ্ছে—আমার নিজেরই হারিয়েছে।'

'তাই বুঝি!' কাজল ভারী অবাক হয়।

'হ্যাঁ তাই।' রানা গম্ভীর।

'তুমি কিচ্ছু জান না—' কাজল প্রতিবাদ করে উঠেছিল, 'ইচ্ছে করে না হারালে কোনো জিনিসই খোয়া যায় না।'

ওর সরলতায় রানা বিস্মিত হয়েছিল। কাজলের কথা সে মনে মনে মানে না। তবু সেদিন প্রতিবাদ করতে পারে নি।

সেদিন মাদুলি প্রসঙ্গ ঘিরে আরো কথা হয়েছিল ওদের মধ্যে। রানার নতুন করে এখন সব মনে পড়ছে। ক'দিন আগেই কাজল তার মা'র কাছে প্রচণ্ড মার খেয়েছিল পয়সা চুরি করার জন্যে। সেই কথাটা হঠাৎ রানার মনে পড়ে গেল। কাজলকে সে বিশ্বাস করে। কাজল চঞ্চল, ডানপিটে কিন্তু চোর না। তাই তার সন্দেহটা

ভাঙবার জন্য সেই কথাই জিজ্ঞেস করে বসল, 'দুদিন আগে তোমাকে পয়সা চুরি করার জন্যে তোমার মা মেরেছিলেন কাজল?'

'হ্যাঁ —' কাজল সহজ গলায় উত্তর দিল।

'ছিঃ, তুমি চুরি করলে কাজল?'

'ইস, চুরি বললেই চুরি হল?'

'তার মানে?' রানা বুঝতে পারল না, 'তাহলে তুমি চুরি করো নি?'

'ওকে কেউ চুরি করা বলে না।'

'কি রকম?' রানার কৌতূহল বেড়ে ওঠে।

'এক ঠাকুরের জিনিস আর এক ঠাকুরকে দিয়েছি। তুমিই বল, এতে চুরির কি হল? আমি তো কিছু করি নি। লক্ষ্মীর কৌটোর পয়সা নিয়েছিলাম। মা-ও তো বহুবার নিয়েছে। ঠাকুরের পুজো দিয়েছে।'

'বেশ তো—তুমি চাইলেই পারতে—' রানা বিজ্ঞের মতো বলতে লাগল, 'না বলে নিলে কেন?'

'চাইলে পেতাম না। অথচ আমার ভীষণ দরকার পড়েছিল।'

'কি এমন দরকার?'

'দরকার এই মাদুলিটার জন্যেই। বিনে পয়সায় মাদুলি নিয়ে ধারণ করলে কোনো ফল হয় না।'

রানা কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। কাজল কত সরল সহজ। তার চোখ জলে ভরে উঠল। সে মুগ্ধ হয়ে গেছে। একটু বাদে ধরা গলায় বললে, 'এই মাদুলিটার জন্য মার খেলে— আমাকে তুমি এত ভালবাস, কাজল?'

কাজল সেদিন মুখ নামিয়ে নিয়েছিল। তারপর জোরে জোরে উত্তর দিয়েছিল, 'না না, আমি তোমাকে একটুও ভালবাসি না।' কথা শেষ করে কাজল দাঁড়ায় নি। সোজা রাস্তায় চলে গিয়েছিল।

রানা বিহ্বল হয়ে ওর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে দেখে।

যেভাবে আকাশে একটা পাখি নিঃশব্দে উড়ে যায় তেমনি যেন কাজল পালিয়ে গেছে তার সামনে থেকে।

পুরনো কথা নিয়ে মশগুল হয়ে ছিল রানা। মাদুলি থেকে কত কথা। কাজলের কথায় সে আবার ফিরে এল আপাতত বর্তমানে। 'তাড়াতাড়ি বাড়ি চল রানা, সেদিনের মতো আবার ঝড়ে পড়তে পারো।'

রানা আকাশ দেখে। সমুদ্রের হাওয়া নিশ্চল। বাতাসে আর্দ্র ভাব। প্রকৃতি খানিকটা থমকে দাঁড়িয়েছে। সূর্য ডুবে গেছে সন্ধ্যার গাঢ়তায়। রানার এই অবস্থা ভাল লাগে। সে আর ভয় পায় না। মাদুলির বিশ্বাসের চেয়ে বড় বিশ্বাস কাজলকে। তাই উত্তর দিল, 'আসুক ঝড়। ভয় পাই না ঝড়কে। তুমি তো কাছেই রয়েছ।'

আকাশের রঙ বদলাচ্ছে।

একটু আগেও মেঘগুলো সিঁদুর মেখে হাজিরা দিচ্ছিল! তারা কোথায় হারিয়ে গেল। তার বদলে থোকা থোকা কালো মেঘ আকাশটা ছেয়ে ফেলল।

কাজল মেঘের রঙ চেনে। তাদের মতিগতি জানে। প্রকৃতির সঙ্গে কোথায় যেন তার একটা অদৃশ্য বন্ধন আছে। যার ফলে সে ভয় পায় না। বিভ্রান্ত হয় না। ঠাণ্ডা মাথায় মোকাবিলা করে সবকিছুর।

মেঘরাশি দেখতে দেখতে কাজল জবাব দিল, 'আমি আর কদিন! তুমি তো চলেই যাবে।' তার গলায় আসন্ন বর্ষার বিষণ্ণতা। মনের ভেতরেও হয়তো এমন কালো মেঘ জমে থাকবে।

রানা কি সেই মেঘ দেখতে পায়! বুঝতে পারে কি তার সামনেও অন্য এক প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে। রানার কথায় দূরের একটা রহস্যের হাতছানি। সে বলে ওঠে, 'যখন তুমি থাকবে না, তখনো আমি আর ভয় পাব না।'

'সে কি!' কাজল আকাশ থেকে চোখ ফেরায়, 'হঠাৎ তোমার এই সাহস হল কি করে?'

'বা রে! হবে না?' রানা হেসে ওঠে।

কাজল এই হাসির মানে বোঝে না। সে সত্যি সত্যি ভাবতে থাকে রানার মনে এই সাহস জোগাল কে? তাই সে ফ্যালফ্যাল করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকে।

রানা তাই দেখে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কি, আমার কথা বুঝতে পারলে না তো?'

'কি করে বুঝব তুমি রাতারাতি বীরপুরুষ হয়ে গেছ।'

'বোঝা উচিত ছিল?'

'বেশ তো!' কাজল বলল, 'আমি কি কারো মনের কথা পড়তে পারি।'

'তোমার দেওয়া মাদুলি।' রানা জামার হাতা তুলে তাকে মাদুলিটা দেখাল, 'এটা কে দিল শুনি?' রানা তার রহস্যটা খুলে ধরল। 'এটা সঙ্গে থাকা মানেই তো তুমি থাকা। মাদুলিটা স্পর্শ করলেই তোমার কথা মনে পড়বে।'

'ও তাই বল!' কাজল নিশ্চিন্ত হয়।

রানা সোজা হয়ে বসে। তার মুখে অদ্ভুত একটা ভাল লাগার হাসি লেগে থাকে। কাজলের চোখে চোখ রেখে বলে ওঠে, 'ঠিক বলি নি?'

'হয়তো ঠিক।' কাজল আনমনা হয়ে পড়ে। সমুদ্রের জল এখন নিরেট কালো। 'ঠিক জানি না।' কাজল উঠে পড়ে। 'আর না, এখুনি ঝড় বৃষ্টি আসবে।'

রানা ওর পাশে পাশে চলতে থাকে। থেমে পড়া হাওয়াটা হিমেল পরশ নিয়ে বইতে শুরু করে। অন্ধকার বেশ জমাট। দুজনে তাড়াতাড়ি পা চালায়। রানার মনে নতুন করে একটা ভাবনা দুলতে থাকে।

হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা কাজল, তোমার তো কোনো মাদুলি নেই, তোমার যদি কোনো বিপদ হয়?'

'আমার মাদুলি লাগে না।'

'কেন?'

'আমি হলাম জং বাহাদুরের নাতনি—' কাজল গলায় জোর দিয়ে বলে, 'সমুদ্রের মেয়ে। ঝড় বৃষ্টি জলে আমার বিপদ হবে না।'

'ঠিক বলেছ।' রানা ওর কথায় সায় দিল। 'একদম ঠিক। সত্যি তুমি হলে সাগরিকা।' রানা সাগরিকা কথাটার পুরোপুরি মানে বোঝে না। শব্দটা শুনেছে। মেয়েদের নাম হয়। কাজলকে পাশে দেখে মনে হচ্ছে এমন মেয়েদেরই বুঝি এই নামটা মানায়।

মেঘের ওপর মেঘ জমছে। আরো মেঘ। হাওয়ার জোর এখন বেশ। হাঁটার গতি ওরা আরো বাড়াল। যদিও ঝড় বা বৃষ্টির ভয়ে না—অন্ধকার এড়ানোর জন্যই ওরা তাড়াতাড়ি মান-ভবনের দিকে চলল।

আরো দুটো দিন কাটল।

ভারী ব্যস্ততাময় দুটো দিন। এ দুদিন কাজল নিজেদের বাড়িতেই প্রায় সময় রয়ে গেল। বড় বাড়িতে খুব কম তাকে দেখা গেল। গোছগাছের ব্যস্ততায় কেনাকাটার জন্যে রানা বা বড়মা কেউই খেয়াল করে নি।

আসলে কাজল একটু একটু করে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছে। সেদিন মেঘলা সন্ধ্যায় ফেরবার পর থেকে কাজল মাত্র বার তিনেক বড় বাড়িতে গিয়েছে। তাও তার মা'র কাজে। আগেই কথা ছিল এ দুদিন রানা চান করতে যাবে না।

দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে হঠাৎ বড়মা-ই বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ রে রানা, কাল থেকে কাজলকে দেখছি না তো?'

রানারও সকাল থেকেই ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। প্রতি মুহূর্তে সে ভাবছে এইবার কাজল আসবে! যেমন সে আসে। হুড়মুড় করে এসে উপস্থিত হবে। এমনি পুরী ছেড়ে চলে যাবে ভেবে মনটা খারাপ। তার ওপর আরো খারাপ লাগছে কাজল কাছে না থাকায়। রানা বড়মার প্রশ্নের জবাবে বলে, 'কি জানি! কোথাও গেছে হয়তো!'

'কোথায় আবার যাবে?' বড়মার মনে সন্দেহর মেঘ। এই দীর্ঘ দিনে মেয়েটা কোথাও যায় নি আর আজ না বলে চট করে চলে যাবে। 'হ্যাঁ রে ঝগড়া করিস নি তো? যে মেয়ে সকাল থেকে হৈহৈ করে বাড়িটা মাতিয়ে রাখে হঠাৎ তার কি এমন হল?'

'ঝগড়া করব কেন?' রানা বলে উঠল, 'এটা কি ঝগড়া করার সময়? যাওয়ার আগে কেউ কারো সঙ্গে ঝগড়া করে!'

'তাহলে ওর একটা খোঁজখবর নে—অসুখ-বিসুখও তো করতে পারে।'

'কাজল বলে, তার কোনো অসুখ হয় না।'

'ও বাবা! ওকি সবজান্তা মেয়ে নাকি!' বড়মা অবাক হয়ে রানার মুখের দিকে তাকান। 'তোর কিন্তু ওর একটা খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। মেয়েটা সারাদিন তোর সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, আর আজ দুদিন আসছে না।' বড়মা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর স্নেহ যেন আর অপেক্ষা করতে পারে না। 'যাই আমিই দেখি, দারোয়ানজীকে দেখে আসতে বলি।

'থাক না—' রানা বাধা দেয়। তার ভেতরে কোথায় একটা লুকনো অভিমান গুমরোতে থাকে। 'কাজল আপনিই আসবে।'

যদিও অদেখা এই প্রতিটি মুহূর্ত রানার মনে হয়েছে সে ছুটে ওদের বাড়ি চলে যায় কিন্তু আভিজাত্যের একটা শক্ত খোলসের মধ্যে রানা আটকা পড়ে। বারবার নিজের মনকে ও জিজ্ঞেস করে, কাজল আসছে না কেন—তার না আসার কারণ কি?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পাওয়ায় তার অভিমানটা দৃঢ় হতে থাকে।

বড়মার সামনে যতই হালকাভাবে সে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিক না কেন, তার ভেতরে একটা ছটফটানি তোলপাড় করছে। কাজলকে দেখার, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য সে যেন প্রস্তুত হয়ে সময় কাটাচ্ছে।

বড়মা ওর কথায় কান দেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ দারোয়ানকে ডেকে কাজলের খোঁজ নিয়ে আসতে বলেন। দারোয়ানকে খুব ভাল করে বলে দেন, বাড়ি থাকলে কাজলকে সে যেন সঙ্গে করে ধরে নিয়ে আসে।

হুকুম পেয়ে দারোয়ান তক্ষুনি বেরিয়ে যায়। সামান্য সময় মাত্র। একটু বাদেই সে কাজলকে সটান অন্নপূর্ণার সামনে হাজির করে। কাজল মুখ নিচু করে এসে দাঁড়ায়।

ওকে দেখতে পেয়েই বড়মা প্রায় দৌড়ে ওর কাছে যান। গায়ে মাথায় হাত বোলান। তারপর ডান হাত দিয়ে চিবুকটা তুলে ধরে প্রশ্ন করেন, 'কি ব্যাপার কাজল ? তুই যে এ বাড়ি আসা বন্ধ করলি ? তোকে কেউ কিছু বলেছে ?'

কাজল চুপ করে থাকে। যেন বোবা সে। বড়মা আবার ওর হাত ধরে বলেন, 'কই আমার কথার উত্তর দে।'

'কেউ কিছু বলে নি আমাকে।' ধরা গলায় এবার কাজল উত্তর দেয়।

'কাল থেকে কি যেন হয়েছে। কিছুতেই আসতে আর ভাল লাগছে না।'

'তোরও তাহলে কষ্ট হয়, কাজল ?' বড়মা ওকে কোলের কাছে টেনে ধরেন। কথা বলতে গিয়ে তাঁর গলাটা কেমন কেঁপে যায়। তিনি ওর পিঠে সস্নেহে একটা হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'আমি তো ভাবতাম, তুই একটা পাগলি, দস্যি মেয়ে। কষ্ট-ফষ্ট তোর

নেই। কষ্ট থাকলে ওই অমানুষিক মার কেউ খেতে পারে।'

'সত্যি বলছি বড়মা।' কাজল এইটুকু বলেই আর কিছু বলতে পারে না। সে কেঁদে ফেলে। এ কান্না কেন তা সে জানে না। শুধু মনে হয় তখন কান্না ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ওর চোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল নেমে আসে।

'এ মা! দেখ তো তুই কাঁদছিস নাকি?' বড়মার কথার মধ্যেও লুকনো কান্না। তবু নিজেকে সামলে নেন তিনি! তাড়াতাড়ি বলেন, 'কাঁদছিস কেন কাজল, আমরা তো আবার আসব।'

'সত্যি বলছ?' কাজল বড় বড় চোখে তাকায়।

'মিথ্যে বলতে যাব কেন?' বড়মা ওর প্রশ্নে অবাক হন।

'আমি সব জানি—' কাজল বলে ওঠে, 'তোমরা তো আবার বহু দিন বাদে আসবে।'

'একথা তোকে কে বলল?'

'রানাই বলেছে।' কাজল ফুঁপিয়ে উঠল। 'কতদিনে পাঁচ বছর হয় বড়মা?'

বড়মা হেসে ফেলেন। করুণ হাসি। 'সে অনেক দিন। আমি কি অত হিসেব জানি নাকি!' বড়মা একটু থামেন। তারপর আবার ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেন, 'ও একটা খুব বেশি দিন নয়। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। রানা তোকে ভয় দেখিয়েছে। এখন আমার সঙ্গে চল। বহু কাজ পড়ে আছে।'

কাজল চলে যায় একবার রানার দিকে তাকিয়ে। রানাও ওকে দেখে। কোনো কথা বলে না।

একটু বাদেই আর একা থাকতে রানার ভাল লাগে না। সে একটু আলগা ভাব দেখালেও সেটা ধরে রাখতে পারল না। পায়ে পায়ে বড়মার ঘরে ঢুকল। কাজল মুখ তুলে ওকে দেখেই মুখ নামিয়ে নিল। হঠাৎ তার ভেতর কেমন একটা লজ্জার ভাব দানা বাঁধল। রানাও সোজাসুজি কথা বলতে পারল না। কেমন রাগ রাগ ঠেকল।

সে তাই বড়মাকে শুনিয়ে বলল, 'বড়মা আমি একটু বেড়িয়ে আসছি। তোমরা তো এখন গোছানোয় ব্যস্ত।'

আসলে কথাটা কাজলকে শোনানোর জন্যই বলা।

'এখন আবার কোথায় যাবি?' বড়মা বলে ওঠেন, 'কাজল এল আর তুই বেরিয়ে যাচ্ছিস—কি ব্যাপার! আমার আপাতত হয়ে গেছে। বরং তুই কাজলের সঙ্গে কথা বল। আমি তোদের জন্যে খাবার নিয়ে আসি।'

কথা শেষ করে অন্নপূর্ণা ঘর ছেড়ে চলে যান।

হঠাৎ একটা অস্বস্তির মধ্যে দুজনে আটকা পড়ে। কেউই কথা বলতে পারে না। অদ্ভুত পরিস্থিতি। কাজল মাটির দিকে তাকিয়ে নখ খুঁটতে থাকে। রানা সেই দিকেই তাকিয়ে দেখে কিছুক্ষণ পরে তার মনে হয় কথা না বলে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বোকামী ছাড়া আর কি! তাই সে হঠাৎ দরজার দিকে পা বাড়ায়।

'এই রানা—'

সঙ্গে সঙ্গে কাজল ডেকে ওঠে। সে আর চুপ করে থাকতে পারে না। রানা পিছন থেকে ডাক শুনে থেমে পড়ে। যদিও মুখ ঘোরায় না।

'আমার ওপর রাগ করেছ?'

'রাগ করব না তো কি!' রানা খুব দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায়। 'দুদিন আস নি কেন? জান বড়মা আমাকে বকে দিলেন।'

'কি করব বল?' কাজল যেন কৈফিয়ত দিচ্ছে। 'কি রকম আসতে ইচ্ছে করছিল না। বিশ্বাস কর একটা কষ্ট···তুমি বুঝবে না, সে তোমাকে বোঝান যাবে না।'

'তুমি খুব বুঝবে? নিজেকে খুব বুদ্ধিমতী ভাব তাই না?' রানা চেঁচিয়েই উঠল। তার চাপা অভিমানটা এতক্ষণে ফেটে পড়ল।

'আজ আবার ঝগড়া শুরু করলে?' কাজল ম্লান হাসল। 'মনে নেই, আমরা ঝগড়া করব না কথা ছিল।'

'তুমিই তো আমাকে দিয়ে ঝগড়া করাচ্ছ।'

'আমাকে তুমি ভুল বুঝলে রানা।' কাজল যেন কেঁদে ফেলবে এমন মনে হল।

রানা তার ওই অবস্থাটা বুঝে ফেলল। তাই সে ভেঙে পড়বার আগেই এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে বসে পড়ল। কাজলের একটা হাত চেপে ধরল। 'কাজল কথা দাও, যতদিন আমরা না যাচ্ছি ততদিন তুমি যেমন আসছিলে তেমনই আসবে। না এলে আমিও যে ভীষণ কষ্ট পাব।'

'কষ্টের বহর তো দেখতেই পাচ্ছি। প্রথম সুযোগেই লাফিয়ে পড়লে।'

'আমার ভুল হয়ে গেছে কাজল, কথা দিচ্ছি আর কোনদিন কারো সঙ্গেই ঝগড়া করব না।'

'আমি তো আর দেখতে যাচ্ছি না।'

'কেন?'

'জীবনে তোমার সঙ্গে আর দেখাই হবে না।'

'কেন দেখা হবে না?' রানা বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই হবে। আজ তোমাকে আর একটা কথাও দিচ্ছি কাজল। বিদেশ থেকে ফিরেই আমি পুরী চলে আসব। তোমার জন্যে বহু জিনিস আনব। নানা রকম বিলিতি গল্প শোনাব।'

'ইস্!' কাজল জিভে শব্দ করল। তারপর বলল, 'জিনিস আনতে তোমার বয়েই গেছে।'

'ঠিক আছে দেখে নিও।' রানা কাজলের কথার ওপর বলল।

বড়মা খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দুজনের দিকে তাকিয়ে বড়মার বেশ ভাল লাগল। তার মনে হল, ওদের অভিমান কেটে গেছে। এই তো দুজনের বেশ মিল দেখা যাচ্ছে।

'এখন চটপট এগুলো খেয়ে নাও।' বড়মা দুজনের মাঝখানে খাবারের থালা নামিয়ে রাখলেন।

রানা খাওয়া শুরু করল সঙ্গে সঙ্গে। কাজল হাত গুটিয়ে বসে রইল। বড়মা তাই দেখে ওকে তাড়া লাগাল, 'কি রে কাজল, তুই খা।'

কাজল থালাটা টেনে নেয়। কিন্তু মুখে না দিয়েই বড়মাকে জিজ্ঞেস করে, 'বড়মা, রানা বিলেত থেকে ফিরলে সত্যি তোমরা আবার এখানে আসবে তো?'

'আসব রে পাগলি আসব।' বড়মা স্নিগ্ধ হাসি মুখে টেনে বলেন, 'তখন দেখব তুই আর পাগলি নেই; শান্ত শিষ্ট হয়ে গেছিস। নে এখন খেয়ে নে তো!'

'বুঝলে বড়মা' রানা খেতে খেতে বলে উঠল, 'কাজল আমার কথা বিশ্বাস করে না। তাই তোমার কাছে জানতে চাইছে।'

'কে বলল বিশ্বাস করি না?' কাজল ফুঁসে উঠল, মিথ্যে আমার নামে লাগাচ্ছ তো?'

'বিশ্বাস করলে আবার জানতে চাইলে কেন?' রানার মুখে দুষ্টুমি।

'আমি তোমাকে কি বলেছিলাম?'

'তোদের আবার কি হল?' বড়মা বলে ওঠেন।

কাজল হেসে ফেলে। 'বড়মা, তোমার খালি ভয় এই বুঝি-আমরা ঝগড়া শুরু করি। তুমি দেখে নিও, আর আমাদের ঝগড়া হবে না।'

'সেই ভাল।'

দুজনে খেতে থাকে। বড়মা ওদের জন্য আরো লুচি পায়েস নিয়ে আসেন। তাই দেখে কাজল লাফিয়ে ওঠে। বলে, 'ওরে বাব্বা! এত খেতে পারব না। আমরা কি রাক্ষস?'

'খুব পারবি।' বড়মা ধমক দেন, 'কি আর বেশি করেছি। তোরা ছাড়া আর খাবার কে আছে শুনি?'

ওরা চেটেপুটে খায়। তাই দেখে অন্নপূর্ণা পরিতৃপ্ত হন। কাজল এখন আর তাঁর চোখে আলাদা কেউ নয়। এ কদিনে সে

রানার সমান স্নেহই কেড়ে নিচ্ছে। বড়মা এটাও বুঝতে পারেন কাজল তাদের অতি আপনজন মনে করেই ভালবেসে ফেলেছে। যার ভেতর কোনো খাদ নেই। তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজল বারবার তারা আবার আসবে কিনা জানতে চাইছে। চলে যাবার সময় যত কাছে আসছে তত কাজল বিচলিত হয়ে পড়ছে। সে ভাবতে পারছে না ওরা চলে যাবে।

অন্নপূর্ণার বুকের ভেতরও কাজলের মতো কোথায় একটা কষ্ট হচ্ছে। একটি চঞ্চল ভাল লাগা মা-মরা কিশোরীকে ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট।

রানার খাওয়া আগে শেষ হয়। সে মুখ ধোবার জন্য উঠে বাইরে যায়। কাজল তখনও খাওয়া শেষ করে নি। মুখ নীচু করে খাচ্ছে।

হঠাৎ অন্নপূর্ণা তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'হ্যাঁ রে কাজল, তুই রানাকে খুব ভালবাসিস, তাই না রে?'

'তোমাকেও।'

'সে আমি জানি রে পাগল মেয়ে।' অন্নপূর্ণা করুণ হাসি হাসেন। 'রানা চলে গেলে তোর খুব কষ্ট হবে, কি বল?'

কাজল এ কথার কোনো জবাব দিতে পারে না। তার চোখ মুখে একটা শূন্যতা ফুটে ওঠে।

'কি রে বল না?' অন্নপূর্ণা পুনরায় ওকে প্রশ্ন করেন।

'হুঁ—' কাজল ছোট্ট জবাব দিয়ে উঠে পড়ে।

'জানি রে জানি। আমি বুঝতে পারি।' অন্নপূর্ণার দীর্ঘশ্বাস ঘরের বাতাসে মিশে যায়। 'যদি সম্ভব হত তোকে আমার কাছে নিয়ে যেতাম। কিন্তু তা হয় না।'

রানা ফিরে আসে ঘরে। একটু বাদে কাজলও এসে পড়ে। হঠাৎ সে বড়মার চোখ দুটোয় মুক্তোর মতো জল আবিষ্কার করে। কাজল অবাক হয়। বড়মা কাঁদছেন।

কিছুক্ষণ পর দুজনে বেরিয়ে পড়ে। রানা আর কাজল। পাশাপাশি হেঁটে চলে। ওদের কোনো দিক ঠিক নেই। শুধু হাঁটার জন্যই হাঁটা। অনেকটা পথ চলার পর রানা বলে ওঠে, 'তুমি না থাকলে এতদিন এখানে আমার ভালই লাগত না।'

'কেন? এখানে সমুদ্র আছে। জগন্নাথ আছেন। এসব তোমার ভাল লাগে না?'

'একঘেয়ে সমুদ্র কি কারো ভাল লাগে?'

'আমার লাগে।' কাজল উত্তর দেয়, 'সমুদ্র না হলে আমি বাঁচবই না।'

'ওই জন্যেই তো তোমার নাম দিয়েছি সাগরিকা।' রানা হাসে। 'সাগরের সঙ্গে তোমার ভাব আমার চেয়েও বেশি।'

বিকেল পড়ে আসছে। সিরসির করে হাওয়া দিচ্ছে। বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে সমুদ্রবিলাসীরা। কটা পাখি ওড়াউড়ি করছে আকাশের অনেক উঁচুতে। ওরা দুজনেও সেই ভিড়ের মধ্যে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছে। ওদের কথা যেন কমে গেছে। বলবার মতো কথা দুজনের কেউই খুঁজে পাচ্ছে না। দুটো একটা কথা, ছোট উত্তর। আবার নীরবতা। এ ভাবেই সময় কাটছে। হঠাৎ রানার মনে পড়ে যায় কি যেন। সে বলে কাজলকে, 'কাজল, কাল আমরা ভুবনেশ্বরে যাচ্ছি পুজো দিতে। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?'

'কখন?'

'একেবারে ভোরে, গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে।'

কাজল ভাবল। তারপর জবাবে বলল, 'মাকে বলে দেখব, মা কি মত দেবে?'

'দি আইডিয়া—' হঠাৎ লাফিয়ে উঠল রানা, 'ঠিক আছে, তুমি তোমার মাকে কিছু বলো না—বড়মাকে দিয়ে বলাব, দেখবে রাজি হয়ে যাবে। তুমি সঙ্গে থাকলে খুব মজা হবে। এর আগে ভুবনেশ্বর গিয়েছ?'

'বাবা একবার নিয়ে গিয়েছিল অনেক দিন আগে। তখন আমি খুব ছোট, কিছুই মনে নেই।'

'তবে তো ভালই হল—' রানা খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল, 'সকালেই চলে এস কিন্তু।'

সমুদ্রের বেলাভূমিতে সন্ধে নামল। দুজনেই বাড়ির পথ ধরল। বড় বাড়ির কাছে এসে কাজল বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

'তাহলে কাল দেখা হচ্ছে?'

'যদি মা রাজি হয়।' কাজল হাসল।

'আমি এখনই বড়মাকে পাঠাচ্ছি তোমাদের বাড়ি।' রানা বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। কাজল নিজের বাড়ির দিকে ফিরল।

রানা বাড়িতে গিয়েই অন্নপূর্ণাকে বলল, 'বড়মা, কাজলকে কাল আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল।'

'অতদূর?' বড়মা চিন্তায় পড়লেন। 'ওর মা যদি রাজি না হয়?'

'তুমি বললেই হবে।' রানা বড়মাকে বলল, 'এখুনি তুমি গিয়ে বলে এস।'

'ঠিক আছে, বলে দেখি।' বড়মা কাজলের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

রানার মনটা হালকা হয়ে গেল। দুদিন ধরে যে অভিমানের মেঘ জমেছিল তা উড়ে গেল হাওয়ায়। কাজল কাল সারাদিন সঙ্গে থাকবে এই কথা ভেবে আরো ভাল লাগল। একা একা রানা এই সুখের স্বপ্নগুলো নেড়েচেড়ে ঘুরতে লাগল। ঘণ্টাখানেক বাদে হাসিমুখে বড়মা ফিরে এলেন। তিনি রানাকে বললেন, কাজলের মা রাজী হয়েছে কাজলকে সঙ্গে নিতে।

খুশিতে টইটম্বুর হয়ে রানা সে রাত্রে ঘুমতে গেল।

ভোর তখনো পুরোপুরি ফোটে নি। কাজল সেই রাতের

অন্ধকারেই বড় বাড়িতে এসে হাজির হল। রানা সবে বিছানা ত্যাগ করে উঠল। সে এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি বলল, 'ও মা, এর মধ্যেই তুমি তৈরি হয়ে এসেছ! আমি সবে ঘুম থেকে উঠলাম। উপরে গিয়ে তুমি একটু বস, আমি মুখটা ধুয়ে নি।'

বড়মাও কাজলকে দেখতে পেল। তিনিও খুব খুশি হলেন। সস্নেহে বললেন, 'তুই এসে গেছিস কাজল, ভালই হল। একটু বস রানাটা এই উঠল। এক্ষুনি গাড়ি এসে পড়বে। সকাল সকাল রওনা না দিলে ফেরবার সময় কষ্ট হবে। আমি তৈরি। রানার হলেই বেরিয়ে পড়ব। তোদের খাবার সঙ্গে নিয়েছি। গাড়িতে খেয়ে নিবি।' ব্যস্ত হয়ে বড়মা ওদিকে কি দেখতে চলে যান।

পনের মিনিটের মধ্যেই শুভযাত্রা শুরু। ওরা তিনজন ছাড়া সঙ্গে দারোয়ানজী। পথে বিপদের কথা বলা যায় না। তাই এই বিচক্ষণ দারোয়ান সঙ্গে চলেছে।

সকাল বেলার ফাঁকা রাস্তা ধরে হুহু করে গাড়ি ছুটছে। রাস্তার দুধারে মনোরম প্রকৃতি ভোরের আলোয় ঘুম ভেঙে চোখ মেলছে। পুরী থেকে ভুবনেশ্বর—পথ খুব বেশি নয়। কাজলের খুব আনন্দ হচ্ছে। এত দূরের রাস্তা মোটর গাড়িতে করে কাজল কখনো যায় নি। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে গাছগাছালি আকাশ দেখছে। মানুষজন ভিড় নেই বললেই চলে। এই সাত সকালে কারই বা এত তাড়া। কাজলের চোখে এই রাস্তাও নতুন। তাই সমস্ত নতুনত্ব নিয়ে রাস্তা কাজলকে টানছে। বাইরের দৃশ্যাবলী দেখায় সে এত তন্ময় যে মন খুলে কথা বলতে পারছে না। প্রতি মুহূর্তে ভয়, চোখ ফেরালেই যদি কোনো দৃশ্য হারিয়ে যায়।

'এই কাজল, খেয়ে নে—' বড়মার গলা কাজলের কানে যায়। সে মুখ ফেরায়।

'কি রে তোর খিদে পায় নি? রাস্তা দেখলেই পেট ভরবে?'

'দেখতে খুব ভাল লাগছে।'

'আমারও।' অন্য দিকের জানলা থেকে রানা বলে উঠল। সেও এতক্ষণ কাজলের মতো বাইরে মুখ বাড়িয়ে ছিল।

'নে ধর।' বড়মা দুজনের হাতে বাক্সভর্তি খাবার তুলে দেন। নানা রকম খাবার। অর্ডার দিয়ে করানো। শুকনো খাবার—গাড়িতে যা খেতে কোনো অসুবিধে নেই। জল রয়েছে ওয়াটার বটলে। খেতে খেতে দুজনে বাইরে তাকিয়ে আছে। হু-হু শব্দে গাড়ি ছুটে চলেছে। গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে। বাইরে শব্দহীন প্রকৃতি। শহর ছাড়িয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। সেখানে আরো নিরিবিলি।

খাওয়া শেষ করে হঠাৎ কাজলের কি মনে পড়ল। সে তাড়াতাড়ি বড়মার দিকে ফিরে বলল, 'বড়মা, তুমি কিছু খেলে না?'

'পুজো না দিয়ে আমি কিছু খাব না।' বড়মা হেসে উত্তর দিলেন।

'ইস্ ভারি ভুল হয়ে গেল—' কাজল আপশোস করে উঠল, 'আমাকে আগে বলবে তো। আমিও খেতাম না। পুজোর পর তোমার সঙ্গে খেতে পারতাম।'

'তুই এখনো বড় হস নি কাজল।' বড়মা গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, 'এর জন্যে দুঃখ করবার দরকার নেই। মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছ তখন এসব জীবনে বহুবার করতে হবে।' একটু হাসলেন বড়মা। তারপর আবার বললেন, 'দূরের রাস্তা, সেখানে কখন পৌঁছব তারপর কতক্ষণে পুজো হবে তার ঠিক নেই। তুই ছেলেমানুষ, এখন এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবি না।'

কাজল আর কথা বলে না।

গাড়ির জানালা গলিয়ে খাবারের ঠোঙা ছুঁড়ে দেয়। হাওয়ায় উড়ে ঠোঙাটা বহুদূর চলে যায়। দেখতে ভারী ভাল লাগে। ভাগাভাগি করে দুজনে ওয়াটার বটল থেকে জল খেয়ে আবার দুধারের দৃশ্য দেখতে থাকে।

এমন খুশি কাজল জীবনে আর হয় নি। আজকের মতো আনন্দ

নিয়ে তার সামনে আর কোনো সকাংই হাজির হয় নি। পুরী থেকে ভুবনেশ্বর খুবই কাছে। তবু যত কাছেই হোক—কাজল মনে মনে ভাবে তার বাবার যে অবস্থা তাতে করে এমন বেড়ানো কোনো দিনই হয়ে উঠত না। এত বড় গাড়ি, এত খাবার! ভাগ্যি রানারা পুরীতে এসেছিল।

খানিকক্ষণ বাদেই দূর থেকে আবার অল্প অল্প বাড়িঘর দোকান চোখে পড়তে লাগল। বেলা অনেকটা হয়েছে। এবার ঘনঘন ঘরবাড়ি ভুবনেশ্বরের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। মন্দিরের উঁচু শীর্ষ বেশ দূর থেকেই কাজল দেখতে পেল। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'রানা, আমার মনে হচ্ছে আমরা পৌঁছে গেছি। দেখছ না কত বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে।'

'হুঁ, তাই তো দেখতে পাচ্ছি।'

ড্রাইভার ওদের কথায় সায় দিল, 'তোমরা ঠিক বলেছ, এখান থেকে মন্দির আর মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ।'

দুজনে মন্দিরের চুড়ো গোনে, 'এক, দুই, তিন, চার……'

'কত গুনবেন দাদাবাবু—গুনে শেষ করতে পারবেন না। এত মন্দিরই আছে। উড়িষ্যাকে মন্দিরের দেশ বলতে পারেন।'

'দারোয়ানজী, তুমি সব মন্দির দেখেছ?'

'কি করে দেখব দাদাবাবু, গরিব মানুষ, সব জায়গায় তো যাই-ই নি।'

'এর আগে ভুবনেশ্বর দেখেছ?'

'তা দেখেছি। ভুবনেশ্বর, কোনার্ক, চিলকা এখানের সবাই দেখে। কিন্তু এ ছাড়াও বহু জায়গায় বহু মন্দির ছড়িয়ে রয়েছে দাদাবাবু।'

শহরের লোকজন দেখা যায়। গাড়ির গতি কমে গেছে। কোলাহল শোনা যায়। গাড়ি একটা রাস্তার মোড় ঘুরতেই দারোয়ান বলে, 'দাদাবাবু, আমরা এসে গেছি।'

দারোয়ানের কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটা একেবারে

মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল। এক এক করে ওরা গাড়ি থেকে নামল।

বড়মা ভীষণ বিপদে পড়লেন। পাণ্ডারা চারপাশ থেকে তাঁকে ঘিরে ধরল। আধা-ওড়িয়া আধা বাঙলায় সকলেই কথা বলতে শুরু করল। দারোয়ান বড়মাকে উদ্ধার করবার জন্যে ওদের হঠাতে চাইল। খানিকক্ষণ টানাপোড়েন চলল এই নিয়ে। শেষ পর্যন্ত বড়মা ওদের শান্ত করতে পারলেন। তিনি একজন পাণ্ডার নাম নিতেই সবাই সরে দাঁড়াল। ওদেরই একজন দৌড়ে গিয়ে তাকে ডেকে আনল।

খবর পেয়ে সেই পাণ্ডা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল। বড়মাকে খুবই সমাদর করে এগিয়ে নিয়ে চলল। বড়মার পিছন পিছন ওরাও চলল। গাড়িতে শুধু ড্রাইভার রইল। দারোয়ানও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে কাঁধে ঝোলা ঝুলিয়ে। কখন কি দরকার লাগে।

কাজল চলতে চলতে মন্দির দেখছে। তার চোখ ঘুরছে চরকির মতো। রানাকে বলল সে, 'দেখ রানা, মন্দিরের বাইরের গড়ন অবিকল পুরীর মতোই। তবে আকারে ছোট। দেখেছ, মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে কি সুন্দর পুতুল বসানো।'

রানাও অবাক হয়ে ইতিহাসের শিল্পনৈপুণ্য দেখে। কি সুন্দর মন্দির। পুরনো দিনের মানুষরা কত যত্নে এই মন্দির তৈরি করেছিল—রানা ভাবে। কাজলের কথা তার কানে যায়। সে উত্তর দেয়, 'হয়তো দুটো মন্দির একই মিস্ত্রী তৈরি করেছে।' কাজলকে কেউ বললেও রানা জানে ওটা একেবারে বানানো। দুটো মন্দির তৈরির মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক। তবে একটির অনুকরণ ও অনুসরণ যে পরবর্তী জন করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

চত্বর পার হয়ে পাণ্ডা ওদের সবাইকে ভেতরে নিয়ে যায়। প্রথমে বিগ্রহ দর্শন করল সবাই। তারপর বড়মাকে পাণ্ডা বসতে বলল এক জায়গায়। 'আপনি বসুন মাইজী, পুজোর এখনো দেরী আছে।

আমি সব ব্যবস্থা করে ঠিক সময়ে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।' ব্যস্ত হয়ে পাণ্ডা কোথায় চলে গেল।

এক জায়গায় বসে থাকতে রানার ভাল লাগে না। সে তাই বলে ওঠে, 'বড়মা, তুমি বরং পুজো-টুজো দাও, ততক্ষণ আমরা দুজন ঘুরে দেখি মন্দিরের চারপাশটা।'

'না না—' বড়মা আঁৎকে ওঠেন ওর কথায়, 'এখানেই আমার সঙ্গে থাক—শেষে কোথায় হারিয়ে আমাকে বিপদে ফেলবে।'

'ওদের যেতে দিন, আপনার কোনো ভয় নেই—' দারোয়ান বলে ওঠে, 'এখানে হারাবে কেন ? মন্দিরের চত্বরের মধ্যেই থাকবে।'

'তবু আমার ভয় করে।' বড়মার মুখে আশঙ্কা।

'আমি বলছি মাইজী ভয় নেই।' দারোয়ান সাহস জোগায়।

'ঠিক আছে, যা তোরা।' বড়মা শেষ পর্যন্ত বলেন, 'কিন্তু দেখিস, দূরে কোথাও যাস না, অজানা অচেনা জায়গা। মন্দিরে নানা ধরনের বাজে লোক থাকে। কাজল তুই রানাকে দেখিস।'

'বড়মা তুমি নিশ্চিন্তে থাক—' কাজল উত্তর দেয়, 'আমরা কাছে কাছেই থাকব, দূরে যাব না।'

দুজনে নাচতে নাচতে দূরে চলে যায়। তারপর ঘুরে ঘুরে চারপাশ দেখতে থাকে। মন্দির গাত্রের অপূর্ব শিল্পকর্ম কিশোর-কিশোরীর মন দুটোকে হঠাৎ টেনে ধরে প্রচণ্ড কৌতূহলে। ছোট ছোট কারুকাজ। দেখতে দেখতে দুজনে তন্ময় হয়ে যায়। একটা বোঝা না-বোঝা আলো আঁধারিতে ওদের মন ঘুরে বেড়ায়। কতক্ষণ ওরা যে এভাবে নিজেদের ভুলে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল নেই। দারোয়ানের ডাক শুনে ওরা নিজেদের ফিরে পায়। দুজন দুজনকে দেখে। হঠাৎ কোথা থেকে একরাশ লজ্জা এসে ওদের মুখ দুটোকে লাল করে দেয়।

দুজনেই মাথা নিচু করে দারোয়ানের দিকে দৌড়ে যায়।

রোদ উঠে গেছে। এখন বেলা অনেক। রানা আর কাজলের মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। দুজনের চোখ দুটোই খুশিতে চকচক করছে।

একটু আগের অনুভূতিটা কেটে যায়। বড়মার সামনে হাসিমুখে দুজনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কাছে পেয়ে অন্নপূর্ণা ওদের মাথায় পুজোর আশীর্বাদী ফুল ছোঁয়ান। বিড়বিড় করে তিনি কিছু প্রার্থনা করেন। বড়মার পাশেই টিকিতে ফুল বাঁধা সেই পাণ্ডা দাঁড়িয়ে। সে ওদের চরণামৃত দেয় কমণ্ডলু থেকে। হাত পেতে ভক্তিভরে চরণামৃত নেয় ওরা। এবার প্রসাদ পায় দুজনে।

এই সব পালা চুকবার পর সবাই আবার গাড়িতে উঠে বসে। শেষবারের মতো কাজল ও রানা লিঙ্গরাজের মন্দিরের দিকে তাকায়। হাতজোড় করে ওরা প্রণাম করে ভগবানের উদ্দেশ্যে। প্রধান মন্দিরকে ঘিরে ইতস্তত ছড়ানো একই ধরনের কিছু মন্দির। এই সব মন্দিরের সামনেও গাড়ি থামে। অন্নপূর্ণা নামেন। সব জায়গাতেই পুজো দেন। ওরাও সেই ফাঁকে মন্দিরগুলো দেখে ঘুরে ঘুরে।

'দেখ কাজল, এই মন্দিরগুলোয় কিন্তু ওই রকম পুতুল-টুতুল নেই।'

রানার কি মনে হওয়ায় সে বলে ওঠে। তার চোখ এতক্ষণ কিছু খুঁজে বেড়ায় যেন।

'ধ্যেৎ! তুমি ভীষণ অসভ্য।' কাজল হেসে উত্তর দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রানার কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরে যায়।

রানা অবাক হয়ে কাজলের দিকে তাকায়। মনে মনে ভাবে, হঠাৎ কাজল তাকে অসভ্য বলল কেন। ভাবতে গিয়ে ওই পুতুল-গুলো তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কী অদ্ভুত ভঙ্গিমা! কী সুন্দর। রানা নিজেও ফিক করে হেসে ফেলল। তারপরই দৌড় লাগাল কাজলের দিকে।

কাজল ততক্ষণ পৌঁছে গেছে বড়মার আড়ালে।

সব জায়গার পুজো শেষ হলে সকলে আবার গাড়িতে উঠে বসল। বেলা তখন বেশ বেড়েছে। গরম লাগছে সকলের। ড্রাইভার

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে পিছন ফিরে বড়মার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কি উদয়গিরি খণ্ডগিরি হয়ে যাবেন?'

খণ্ডগিরি উদয়গিরি বিখ্যাত জায়গা। এই স্থান ঘিরে কিম্বদন্তী আছে। বেলা হয়ে যাওয়ায় অন্নপূর্ণা পুরীতেই ফিরে যেতে চান। তিনি বহু আগে কর্তার সঙ্গে এসে এসব দেখে গিয়েছেন। তাই ড্রাইভারকে বললেন, 'পুরীই ফিরে চল। ঘুরতে গেলে আরো দেরী হয়ে যাবে।'

'বড়মা, চল না উদয়গিরি, খণ্ডগিরি—' কাজল মিনতিমাখা গলায় বলে ওঠে, 'আমি কোনো দিন সত্যিকারের পাহাড় দেখি নি। যা দেখেছি তা বালির।'

'তাই চল বড়মা' রানাও সায় দেয় কাজলের কথায়, 'বড় হয়ে আমিও তো দেখি নি। সেই কবে ছোটবেলায় দেখেছিলাম। কাজলেরও পাহাড় দেখার আশ মিটবে।'

'দেরী হয়ে যাবে যে!'

'কত আর দেরী হবে?' রানা বলে, 'দেরী হলেই বা কি ক্ষতি!'

'তবে চল।' বড়মা অগত্যা রাজী হলেন। কাজলের জন্যেই তিনি মত পালটালেন।

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে সেইদিকের পথ ধরল। হু-হু করে গাড়ি ছুটে চলল। কাজল আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। বড়মা রাজী হয়েছেন এ যেন অভাবনীয়।

গাড়ির বাইরে জানালা দিয়ে তাকানো কাজলকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে কাজল?'

'দারুন।' কাজল একমুখ হাসি নিয়ে ওর দিকে ফিরল। 'কি রকম ভাল লাগছে আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না রানা।'

ড্রাইভারের চেষ্টায় ওরা খুব অল্প সময়েই পাহাড়ের সামনে পৌঁছে গেল। কাজল লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল। চোখের সামনে পাহাড় দেখে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কাজল তাকিয়ে রইল।

বড়মা পাহাড়ে উঠবেন না। একটা ছায়াচ্ছন্ন জায়গা দেখে তিনি সেখানে বসলেন। একজন গাইড ঠিক করল ড্রাইভার। সেই গাইডের সঙ্গে রানা আর কাজল ছুটে চলল পাহাড়ের দিকে। কাজল আগে আগে। তার উৎসাহ প্রচণ্ড। রানা ওর পিছনে। পিছন থেকেই রানা চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এই কাজল আস্তে চল, এটা কিন্তু চটক পাহাড় নয়, হোঁচট খেয়ে পড়লে হাত-পা ভাঙবে।'

'ভয় নেই রানা—' সামনে থেকে কাজলের চিৎকার ভেসে আসে, 'আমি পড়ব না।'

দুজনে ঘুরে ঘুরে পাহাড় দেখে। সঙ্গের গাইড ওদের প্রচলিত গল্পগাথা নামতার মতো আউড়ে যায়। একবার গুহার মধ্যে ঢোকে। গা ছমছম ভাব। একবার টিলার মাথায় এসে দাঁড়ায়। নিচে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। কাজলের মনটা ভরে যায় অপূর্ব এক আনন্দে। রানাও আনন্দিত। তারও ভাল লাগছে। এর আগে যখন সে এসেছে তখন ছোট। তখন বোঝবার মতো জ্ঞান তার ছিল না। এখন একটা রোমাঞ্চ আর আনন্দ তার মনকে কানায় কানায় ভরে তুলেছে।

পাহাড় দেখা দুজনের আর ফুরোয় না। একবার এদিকে যায় আবার ওদিকে। বহুক্ষণ কেটে যায়। দুপুর হয়ে গেছে। বড়মা ছটফট করে ওঠেন। চিৎকার করে ওদের ডাকতে থাকেন, 'রানা, কাজল, অনেক বেলা হয়ে গেছে; এবার নেমে এসো, আর না। রোদে এত দৌড়লে অসুখে পড়বে যে।'

অনেক ডাকাডাকির পর ওরা সাড়া দেয়, 'যাই বড়মা।'

ওরা নেমে আসে। মুখগুলো টকটকে লাল। দুজনের ওই চেহারা দেখে বড়মা বলে ওঠেন, 'উঃ, কি দৌড়লি রে বাবা! ধন্যি তোরা দুটিতে। পাথরের মধ্যে এমন কি আছে রে?'

'সে তোমায় বলতে পারব না বড়মা, তবে কি ভাল যে লাগছিল! এত তাড়াতাড়ি ডাকলে কেন?'

'তাড়াতাড়ি!' বড়মা অবাক হন। 'তোদের এর নাম তাড়াতাড়ি! বলি ক্ষিধে তেষ্টাও কি পায় না?'

'হ্যাঁ বড়মা, খুব ক্ষিদে পেয়েছে আমার।' রানা বড়মার গলা জড়িয়ে ধরে। 'এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'আমারও বড়মা।' কাজলও সঙ্গে সঙ্গে বলে।

'চল, যেতে যেতে গাড়িতে খাবি।' বড়মা উঠে দাঁড়ান।

দারোয়ান সব গুছিয়ে গাড়িতে তোলে। ওরাও উঠে বসে। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দেয়।

গড়ির ভেতরে দুজনের হাতেই বড়মা খাবার তুলে দেন। ওরা যেতে যেতে মহানন্দে খেতে থাকে।

প্রাক্ অপরাহ্নে পুরীতে ফিরে আসে রানারা। গাড়ি থেকে নেমেই কাজল বলল, 'বড়মা আমি বাড়ি যাই?'

'কেন?' বড়মা চোখ তুলে ওর দিকে তাকালেন।

'অনেক দেরী হয়ে গেছে।'

'দেরী আবার কোথায়?' বড়মা বলে ওঠেন, 'এখন যাবি কি, জিরিয়ে একদম রাত্রের খাওয়া খেয়ে তারপর যাবি। দারোয়ান পৌঁছে দেবে।'

'সেই ভাল কাজল।' রানা ভীষণ খুশিতে তাড়াতাড়ি বলে।

'মা যদি আবার বকে?' কাজলের চোখে ভয় ফুটে ওঠে।

'বা রে বকবে কেন?' রানা জানতে চায়।

'বকবে না--' বড়মা ভরসা দেন, 'ওপরে চল, পিছনের বারান্দা দিয়ে তোর মাকে ডেকে বলে দিচ্ছি। এমনি তো তোর মা জানে, তুই আমাদের সঙ্গে আছিস।'

কাজল চুপ করে যায়। কথা বলতে বলতে ওরা উপরে উঠে আসে। রানার ঘরে ঢুকে দুজনেই শুয়ে পড়ে বিছানায়। দুজনেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে এতক্ষণে সেটা বোঝা যায়। ক্লান্তিতে কেউ আর কথা বলতে পারে না। কখন এক সময় দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যের পর বড়মা রানার ঘরে ঢোকেন। মধ্যে বার দুয়েক তিনি ওদের দেখে গেছেন। অঘোরে ঘুমুচ্ছে বলে কাউকেই আর ডেকে তোলেন নি।

এবার ডাকলেন স্নেহের স্বরে, 'এই রানা, এই কাজল, এবার ওঠ। সন্ধ্যে হয়ে গেছে।' তিনি এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন সকলের রাত্রের খাবার ব্যবস্থা করবার জন্যে।

দুজনেই গাঁইগুঁই করে। বিছানা ছাড়তে চায় না। তখনো ওদের ক্লান্তি ফুরোয় নি। মুখে জবাব দেয়, 'এই উঠছি বড়মা। আর একটু বড়মা।'

বড়মা বলে ওঠেন, 'তখন তোদের দুটোকেই পইপই করে বারণ করেছিলাম অত দৌড়াস নি। এখন দেখতো শরীরের কি হাল হয়েছে। এখন ওঠ। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নে—তারপর একদম ঘুমিয়ে পড়বি।'

কথা শেষ করে বড়মা বাইরে চলে যান।

কাজল এবার উঠে বসে। সে দেখে ঘরের আলো জ্বলছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বুঝতে পারে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। তার মনের মধ্যে আবার ভয় উঁকি মারে। কে জানে বড়মা তার মাকে বলেছেন কিনা।

'চল রানা, হাত মুখ ধুয়ে নি। রাত হয়ে এসেছে।' কাজল আস্তে আস্তে বলে।

'তুমি যাও—' রানা শুয়ে শুয়েই ওকে জবাব দেয়, 'আমার নড়বার ক্ষমতা নেই।'

'তুমি ভীষণ নরম। ছেলেরা কিন্তু এ রকম হয় না।'

'মেয়েরা বুঝি তোমার মতো হয়, না?' রানা তড়াক করে উঠে বসল। প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে কাজলের দিকে তাকাল।

'জানি না যাও। তুমি না গেলে আমি চললাম।' কাজল বিছানা থেকে নেমে পড়ল।

'কাজল, এই কাজল শোন—'

রানা ডাকতে লাগল। কাজল দাঁড়াল না। সে সাড়া না দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রানা কিছুক্ষণ বসে রইল। একা একা ভাল লাগল না। তাই সেও বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল। কাজলের খোঁজে নেমে গেল নীচের তলায়।

একটু বাদেই বড়মা ওদের তুজনকে খেতে দিলেন। ক্ষিধেও পেয়েছিল; সেই সঙ্গে ঘুম এখনো যায় নি চোখ থেকে। খেতে খেতেই আবার বাড়ির কথা মনে পড়ল কাজলের। সে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করল। তারপর বড়মাকে বলল, 'বড়মা, আমি এবার বাড়ি যাই ?'

'হ্যাঁ যাও।' বড়মা জবাব দিলেন। 'দাঁড়াও, দারোয়ানকে ডেকে দিই।' বড়মা দারোয়ানকে ডেকে বললেন, 'কাজলকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এস।'

কাজল দারোয়ানের সঙ্গে নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়াল। তার হাতে বড়মার তুলে দেওয়া প্রসাদ।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে হঠাৎ কাজলের মনে হল, মধ্যে আর একটা মাত্র দিন—ব্যাস, তারপরই রানা আর থাকবে না। ওরা ফিরে যাবে কলকাতায়। কাজল একা পড়ে থাকবে, আর থাকবে সীমাহীন সমুদ্র।

আরো একটা রাত কেটে যায়। বাড়ি ফিরে কাজল আর দাঁড়ায় না। খাওয়ার পাট চুকিয়েই এসেছে। তার চোখ ভর্তি ঘুম। মা'র হাতে প্রসাদ তুলে দিয়ে সে কোনো রকমে বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

ঘুমের মধ্যে কাজল স্বপ্ন দেখল। অদ্ভুত অথচ সুন্দর স্বপ্ন। কাজল দেখতে পেল ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির। মন্দিরের সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা. সেইখানে রানার হাত ধরে সে ছুটছে।

ছুটছে তো ছুটছেই। এই ছোটার শেষ বুঝি কোনো দিনই হবে না। মন্দিরের গায়ে সেই অপূর্ব খোদাই করা মূর্তিগুলো। কি একটা কৌতূহলের আকর্ষণ। যে কৌতূহলে রানা তাকায় ওর দিকে, ও তাকায় রানার দিকে। হঠাৎ কাজলের মুখ লাল হয়ে যায়। সে চোখ ফেরায়। আবার ছোটে। এবার রানার হাত ধরে না। রানা পিছনে পড়ে রয়েছে—সে একাই চলেছে। স্বপ্নটা কয়েকবার দেখে। এই পর্যন্ত দেখার পরই স্বপ্ন মিলিয়ে যায়। ঘুমের ঘোরে বারকয়েক রানার নাম ধরে ডেকে ওঠে কাজল। সকালে ঘুম ভাঙলে সে ভুলে যায় স্বপ্ন।

প্রতিদিনের মতো খুব ভোরে কাজলের ঘুম ভেঙে গেল। চোখে মুখে জল দিয়েই সে পা বাড়াল বড় বাড়ির দিকে। কে যেন তাকে টেনে নিয়ে এল।

দারোয়ান ছাড়া বড় বাড়ির কেউ তখনো ঘুম থেকে জেগে ওঠে নি। ওকে দেখেই দারোয়ান হেসে ফেলল। দরজা খুলে আদর করে বলল, 'যাও, তুমি ভিতরে চলে যাও।'

কাজল খানিকটা ইতস্তত করল। তারপর আস্তে আস্তে উপরে গেল। বারান্দা আবছা অন্ধকার। ভোরের আলো তখনো পুরোপুরি ফুটে ওঠে নি। দুটো ঘরের দরজাই ভেজানো। কাজল তাই দেখে ভাবে, ফিরে যাবে কিনা। তারপর কি মনে হওয়ায় রানার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। বন্ধ দরজায় আলগা ধাক্কা দেয়।

কাজলকে অবাক করে শব্দ না করে দরজা খুলে গেল। ভয় পেল কাজল। সে ভাবতেই পারে নি দরজা বন্ধ না করে রানা ঘুমিয়ে আছে। পালাবে কিনা ভাববার আগেই রানা চোখ খোলে।

সেই আবছা আলোয় আধোঘুমে কাজলকে ঘরের ভেতর দেখে রানা আশ্চর্য হয়ে যায়। সে স্বপ্ন দেখছে না তো! তার মুখ থেকে অস্ফুটে বেরোয়, 'তুমি!'

'হ্যাঁ—আমি—।' কাজল থতমত খেয়ে জবাব দেয়, 'বেড়াতে যাবে না? তাই এলাম।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', যাব।' রানার মনে পড়ে। রানা লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ে। 'তুমি একটু দাঁড়াও। জামা কাপড় পরে নি।'

কাজল বারান্দায় অপেক্ষা করে। ঘরে ঢোকে না। একটু বাদে রানা বেরিয়ে আসে। বলে, 'চল।'

ওরা দুজনে এগোতে থাকে। বড়মার ঘরের কাছে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকে রানা, 'বড়মা, বড়মা ওঠ। আমি কাজলের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি।'

অন্নপূর্ণার সাড়া পাওয়া যায়। ঘর খুলে তিনি বেরিয়ে আসেন। বলেন, 'কি রে. তুই কি রাত জেগে বসেছিলি নাকি!' তাঁর মুখে স্নিগ্ধ স্নেহের হাসি।

কাজল কোনো উত্তর দেয় না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে মনে বোঝে, সে একটু বেশি সকালেই এসে পড়েছে। আরো কিছু বাদে আসা উচিত ছিল।

'এখনো আলো ফোটে নি—' অন্নপূর্ণা বাইরের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'সাবধানে যাস।'

বড়মার অনুমতি পেতেই দুজনে তরতর করে নেমে রাস্তায় এসে পড়ে। এত ভোরে রানার খুব ভাল লাগে। কেমন অদ্ভুত একটা ঘোরমাখা ভোর। রানার মনেই পড়ে না পুরীতে আজ তার শেষ দিন। তাই সে খুশিতে বলে ওঠে, 'কাল তুমি চলে যাওয়ার পর সেই যে ঘুম দিয়েছি কাজল, আর এই উঠলাম। খুব ঘুমিয়েছি।'

'আমিও।' কাজল উত্তর দিল চলতে চলতে। 'একটা মজার স্বপ্নও দেখেছি।'

'তুমিও তাহলে স্বপ্ন দেখেছ?' রানা ভারি আশ্চর্য হয়। 'কি স্বপ্ন?'

কাজল এবার অবাক হয়। থেমে পড়ে বলে, 'মানে? তাহলে তুমিও স্বপ্ন দেখেছ?'

'হ্যাঁ—' রানা জবাব দেয়। 'কাল দুজনেই একসঙ্গে স্বপ্ন দেখেছি ঘুমের মধ্যে। জানতে চাইছি এখন, স্বপ্নটাও এক কিনা?'

'আমি কি দেখেছি জান?' কাজল বলতে লাগল, 'তুমি আর আমি দৌড়চ্ছিলাম······ক্রমশ তুমি দূরে চলে যাচ্ছিলে। এই সব।'

'ও মা, আমিও যে তাই দেখেছি!' রানা বলে ওঠে। 'দুজনেই বোধ হয় এক কথা ভেবেছি!'

ওরা সমুদ্র তীরে এসে পড়ল। আবছা ভোরের আলো উঁকি দিচ্ছে। পুব আকাশে তখনো সূর্যের উপস্থিতি প্রকাশ পায় নি। বালুবেলার ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে আঁচলের ওপর দুজনে গিয়ে বসল। শরীরে ভিজে বালির ঠাণ্ডা ছোঁয়া। রানা তার স্বপ্ন কাহিনী বলতে লাগল। কাজল আগ্রহ নিয়ে শুনছে। তার চোখে মুখে কৌতূহলের আলপনা। অখণ্ড সেই নিরিবিলিতে ধারে কাছে একটাও লোক নেই।

'লিঙ্গরাজের মন্দিরের সামনে খোলা জায়গায় হাত ধরাধরি করে আমরা দুজনে ছুটছি। ছুটছি আর হাসছি। তোমার কোঁকড়া খোলা চুল হাওয়ায় উড়ছে। উড়ছে শাড়ির আঁচল। খিলখিল করে আনন্দের শব্দ হচ্ছে। তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। হঠাৎ তোমার হাতটা আমার হাত থেকে খুলে গেল। ···কিছু বুঝবার আগে দেখলাম তুমি একা ছুটে চলে যাচ্ছ···কি তীব্র তোমার সেই গতি। ···পিছনে পাল্লা দিলাম ধরবার জন্যে। পারলাম না।···গলা ফাটিয়ে কাজল বলে চিৎকার করলাম কয়েকবার। তোমার সাড়া পাওয়া গেল না। ···আমার ঘুমও ভেঙে গেল। ঠিক তুমিও এসে আমায় ডাকলে।'

কাজল কোনো কথা বলল না। মনে মনে শুধু একবার নিজের স্বপ্নের সঙ্গে রানারটা মিলিয়ে নিল।

কি ভাবতে গিয়ে হঠাৎ কাজলের মনে পড়ল, পুরীতে আজই তো রানার শেষ দিন। কাল থেকে ওকে আর দেখতে পাওয়া

যাবে না। রানা থাকবে না। বুকের ভেতর হাওয়া ঢুকে কেমন হুহু করা অনুভূতিকে জড়ো করল। সকালটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। কি রকম স্বাদহীন। কাজল স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

ঠিক এই বিষণ্ণতার মুহূর্তকে ধরে পুবদিক লাল হতে শুরু করেছে। নতুন একটা দিনের জন্ম হচ্ছে। দিগন্তে লাল রঙ বিস্তারিত হচ্ছে ক্রমান্বয়ে। ভৈরবীর গম্ভীর অথচ বিষণ্ন সুর চারপাশে ছড়িয়ে আছে। রানা বুঝতে পারে না কাজলের মনের কোনো বদল হয়েছে। সকালের আলোয় তার মন তাজা ঝকঝকে। সে বাড়ি থেকে বেরোবার মুহূর্তেই ভেবে নিয়েছিল আজ কাজলের সঙ্গে অনেক কথা বলবে। তেমনি ভাবেই তৈরি হচ্ছে সে। অথচ কাজল ঠিক তার উল্টোটাই ভাবছে। কথা বলতে তার মন একদম চাইছে না।

রানা তার পিঠে চাপড় মেরে বলল, 'কি হল তোমার? চুপ করলে হঠাৎ?'

'কি আবার হবে?' কাজল মুখ ফেরাল। 'কিছু না।' চোখের ওপর ভেসে আসা জলটুকু আড়াল করতে চাইল।

'তবে কথা বলছ না কেন?'

'কি বলব?'

'যা খুশি। রোজ যেমন বল।' রানা দুহাত বাড়িয়ে কাজলের মুখটা নিজের দিকে ঘোরাতে চাইল।

'না না, রানা, আমাকে ছেড়ে দাও!' কাজল চিৎকার করে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। বলল, 'আমার ভাল লাগছে না। আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

কথা শেষ করেই সে বাড়ির পথ ধরল। হনহন করে হেঁটে চলল। পিছনে তাকাল না। রানা বোকার মতো ওকে যেতে দেখল কিন্তু কি করবে বুঝে উঠতে পারল না।

অনেকটা দূরে কাজলের ছায়া ছায়া শরীরটা আবছা হয়ে যেতেই রানার যেন খেয়াল হল, কাজল নিশ্চয়ই রাগ করে বা দুঃখ পেয়ে

চলে গেল। এতক্ষণে রানার মনে পড়ল, পুরীতে আজই তার শেষ দিন। এবার সেও বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। মনটা ভার হয়ে উঠল পাথরের মতো। সামনে অপূর্ব এক নতুন সূর্য তাকে খুশি করতে পারল না। শেষ দিনে এইভাবে কাজল চলে গেল। রানা পাগল হয়ে উঠল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, 'কাজল…'

তারপরই একলাফে উঠে পড়ে কাজলের চলে যাওয়া পথে দৌড়তে লাগল দুরন্ত বেগে। চলতে চলতে তার মনে হল, রাত্রে দেখা স্বপ্নটা সত্যি হয়ে যাচ্ছে, ভীষণভাবে সত্যি। নিষ্ঠুর বাস্তব। রানা মাথা ঝাঁকাল বারবার। পাগলের মতো বিড়বিড় করতে লাগল। না, না, এ হতে পারে না।

হতাশ ভাবে আলগা পায়ে বাড়ি ফিরে রানা সিড়ি ভেঙে উপরে উঠতে থাকে। থমথমে ভারি মুখ। সামান্য সময়ের হেরফেরে গম্ভীর হয়ে গেছে। দোতলায় উঠে বারান্দার মুখেই বড়মার সঙ্গে দেখা। ওকে দেখে বড়মা চমকে যান। রানার মুখের ভাব পরিবর্তন তাঁর চোখে ধরা পড়ে। তিনি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারেন না। সঙ্গে কাজলও নেই। বড়মা তাড়াতাড়ি ওর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন, 'কি রে, এখুনি ফিরে এলি ?'

রানা জবাব দেয় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'কি হয়েছে তোর ? কাজল কোথায় ?'

রানা কোনো জবাব না দিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। বড়মা এবার বাধা দেন। দুহাতে জড়িয়ে ধরেন রানাকে। ওর স্তব্ধতায় তিনি ভয় পেয়েছেন। তাই ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, 'রানা, খুলে বল তোর কি হয়েছে ?'

'কিছু হয় নি বড়মা। আমাকে ছেড়ে দাও—' কথা বলতে বলতে সে নির্ভয় আশ্রয় বড়মার বুকে মুখ লুকায়। থরথর করে তার শরীর কাঁপতে থাকে।

অন্নপূর্ণা বোঝেন একটা কোনো আঘাত পেয়েছে রানা। তাই

ওর ভাবাবেগ না কাটা পর্যন্ত তিনি ওর পিঠে মাথায় হাত বুলোতে থাকেন। অপেক্ষা করেন শান্ত হয়ে রানা কথা বলবে, তার।

একটু বাদে রানাকে যখন বেশ খানিকটা স্বাভাবিক মনে হয় তখন তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'কাজল কোথায় ?'

'জানি না।' রানা বলে ওঠে, 'আমাকে না বলে হঠাৎ কোথায় চলে গেছে।'

'তুই কিছু বলেছিস ?'

'না, বড়মা।' রানা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে ওঠে, 'বুঝতেই পারলাম না ওর কি হল!'

'তার জন্যে মন খারাপ করছিস কেন ? দেখবি একটু বাদেই সে এসে পড়বে।'

'ও আর আসবে না বড়মা।'

'তোকে বলেছে ? তুই সবজান্তা নাকি।' বড়মা রানার চুলের ভেতর আঙুল চালাতে থাকেন। 'তাহলে তুই নিশ্চয়ই একটা কিছু বলেছিস ? না হলে ও রাগ করবে কেন ?'

'বিশ্বাস কর বড়মা, কিছুই বলি নি। আপনা থেকেই কাজল চলে গেল।'

'বেশ। তুই চুপ করে ঘরে বোস। দেখ ওকে আমি খুঁজে নিয়ে আসছি।'

'কোথায় খুঁজে পাবে ?' রানা অন্নপূর্ণার দিকে তাকায়।

'সে আমি বুঝব এখন।' অন্নপূর্ণা ওকে একা থাকতে দিয়ে চলে যান সামনে থেকে।

জলের খুব কাছাকাছি বসেছে ওরা পা ছড়িয়ে। দুজনের মাঝখানে কিছু ফেনা আর ভিজে বালি। রোদ উঠেছে চারদিক ঝলমলিয়ে। এখন বেলাভূমে মানুষ কম। সকালের প্রাতঃভ্রমণকারীরা

বেড়িয়ে ফিরে গেছে। স্নান করবার লোকজন এখনো আসরে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি।

ওদের কথা আলাদা। ওরা আজ সকাল সকালই জলে নেমেছে। এখন সাতটাও বাজে নি। ঘণ্টা দুয়েক আগের কথাই ভাবছে রানা। হঠাৎ কাজল কোথায় চলে গিয়েছিল একা। তারপর বড়মা নিজে গিয়ে ওদের বাড়ি থেকে ওকে পাকড়াও করে নিয়ে আসেন। কাজলের মাকে বলেছেন। আজ সারাদিন কাজল তাদের সঙ্গে থাকবে। বড়মা-ই দুজনকে এত সকাল সকাল ঠেলে পাঠিয়েছেন একটু আগে। তিনি চাইছিলেন নিভৃতে ওরা দুজনে নিজেদের ভুল শুধরে নিক। কথা বলুক। যাওয়ার আগে এমন খারাপ মন নিয়ে যাওয়া ভাল না।

হাতের তালুতে ভর রেখে রানা আকাশ দেখছে। নীল আকাশ। তার বুকে ভাসমান সামুদ্রিক পাখি। সীগাল। কাজল হাঁটু মুড়ে সামনের দিকে মুখ করে বসে। ডুরে শাড়ি। হলুদ জামা। কাজলকে বেশ লাগছে। টান করে বাঁধা খোঁপা। মুখটা টলটলে।

রানা আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে চারপাশ দেখতে লাগল। সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখছে। কাল থেকে এই মনোরম দৃশ্যাবলী সে আর দেখবে না। ভবিষ্যতেও কোনো দিন পুরীতে বসে এই সব হয়তো আর দেখা হয়ে উঠবে না।

জোয়ারের জল বাড়ছে। ওদের পায়ের পাতা ভিজে উঠল। মনটাও সেই সকাল থেকে ভিজে আছে। ভারি পাথরটা এখনো সরে যায় নি। কাজল ফিরে এলেও সেই সকালটা আর পাচ্ছে না সে। কথাও হারিয়ে গেছে। অথচ চুপচাপ থাকলে দুঃখটা মনকে যেন আরো পেয়ে বসে। অনেক ভেবেচিন্তে রানা কথা বলে কাজলকে উদ্দেশ্য করে।

'আজই শেষ, কাজল!'

'হ্যাঁ—' কাজলের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। 'কত অল্প সময়!' সে যা

ঘটবে তাকে মেনে নিয়েছে। তাই বলে, 'তোমাদের যে না গিয়ে কোনো উপায় নেই।'

'তা ঠিক।' রানার গলা ভারি। 'আজকের এই যাবার কথা তো কবে থেকে ঠিক।'

'তাই বলছি তোমরা নিরুপায়।'

কাজল উদাস চোখে সামনের ঢেউ দেখে। একের পর এক ঢেউ আসছে। ভেঙে পড়ছে। আবার ফিরে যাচ্ছে। একটা নিয়মের ঘোরাফেরা। নিয়ম মতো আসছে, চলে যাচ্ছে। রানাও একটা বাঁধাধরা হিসেব মতো পুরীতে এসেছিল। এখন ফিরে যাচ্ছে। কত মানুষ প্রতিদিন আসছে যাচ্ছে। শুধু কাজল যায় না। এও কোনো নিয়ম। সমুদ্রের সঙ্গে একা কাজল শুয়ে থাকবে। দেখবে হাজার মানুষের আসা-যাওয়া আর লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের ওঠা-পড়া।

একটা বড় ঢেউ ওদের পায়ের খানিকটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল। দুজনে কেমন সম্মোহিতের মতো সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ বাদে রানা ডাকল, 'কাজল।'

'কি?'

'আজ একটা কথা দেবে আমাকে?'

'কি কথা?'

'আগে বল, কথা দেবে, তবেই বলব।'

'আগে শুনি কথাটা কি?' কাজল গভীর চোখ দুটো ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল।

সেই চোখে রানা কি দেখল কে জানে। খানিক চুপ করে কি যেন ভাবল। তারপর খুব আস্তে বলল, 'না, থাক।'

কাজল তখনো তাকিয়ে আছে। রানার চোখ এবার নিচের দিকে। ঠিক যেন ভরসা পাচ্ছে না সে। বলতে কোথায় যেন আটকাচ্ছে।

কাজল ওর দ্বিধাটুকু বুঝল কি না কে জানে। শুধু জোর গলায় বলে উঠল, 'কেন, থাকবে কেন—কথাটা বলেই ফেল।'

'না বলাই রইল কথাটা—' রানা ম্লান হাসল, 'চল, এবার চান করা যাক।'

কাজল উত্তর দিল না ওর কথার। তার মুখ ভার। সেই চেহারা দেখে রানার মনে হল কথাটা বলাই ভাল। রানা হেসে উঠল জোর করে। 'কি হল, অমনি মুখ ভার—তোমাকে কি এমন বললাম?'

'কথা দেবার কথা বললে অথচ কথাটাই বললে না, এতে কার না রাগ হয়?'

'শুনলে যদি রাগ বেড়ে যায়?'

'সে আমি বুঝব, আগে তুমি বল। না বললে সকালের মতো চলে যাব। যাওয়ার আগে আর দেখা করব না।'

'বেশ বাবা, বলছি।' রানা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তুমি আজ আমায় কথা দাও, মার খাওয়ার মতো কোনো কাজ আর তুমি কখনও করবে না।'

'দিলাম।'

'রোজ সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরবে!'

'ফিরব।'

'ঠিক বলছ, কথা দিচ্ছ তো?'

'ঠিক।'

বেলা বাড়তেই স্নানার্থীদের কোলাহল বেড়ে উঠল। সমুদ্রের শব্দ। হাওয়ার সোঁ-সোঁ। কাজলের চুল উড়ছে। সব কিছু ভরে আছে তবু একটা শূন্যতা যেন বড় হয়ে দুজনের চোখের সামনে দুলছে। কাজল পারছে না। এই শূন্যতা সহ্য করতে পারছে না। বাধ্য হয়ে সে কথা বলল, 'তোমার আর কিছু বলার নেই?'

'আবার কি?' রানা জবাব দিল।

'শুধু এইটুকুই ছিল?' কাজল মুখ নামিয়ে নিল। 'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম তোমার আরো বলার আছে।'

রানা বুঝতে পারল না কাজল কি বলতে চায়। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

কাজল চোখ তুলতেই চোখাচোখি হল। 'অমন হাঁ করে কি দেখছ ?'

'তোমার কথাটার মানে খুঁজছি।'

'লোকে আমাকে পাগল বলে।' কাজল হাত দিয়ে সামনের মুখে পড়া চুল সরাল, 'আমার কথার আবার কোন মানে হয় !'

'আমি তোমায় পাগল বলি না।'

কাজল সামান্য চুপ করে রইল। একটু পরেই গম্ভীর ভাবে বলল, 'আমার কাছ থেকে তো কথা নিয়ে ছাড়লে, এবার বল আমার একটা কথা আছে রাখবে ?'

'শুনি।'

'আগে কথা দাও।'

'দিলাম।' রানা কাজলের দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকাল।

'আমাকে চিঠি দেবে ?'

'চিঠি !' রানা একটু থতমত খেয়ে যায়। তারপরই বলে, 'নিশ্চয়ই দেব।'

'আমার চিঠি না পেলেও ?' কান্নায় কাজলের গলা বুজে আসছিল। সমস্ত শক্তি জড়ো করে সে নিজেকে সামলাল।

রানা সঙ্গে-সঙ্গে এ কথার জবাব দিতে পারল না। সে শুধু অনুভব করল তার সামনে সমুদ্র, আর সেখানে অবিরাম ঢেউ উঠছে নামছে।

'কই বললে না ?' কাজল আবার জিজ্ঞেস করল।

'দেব।' ঝাপসা হয়ে হারিয়ে গেল রানার কথা। সে আর বসে থাকতে পারল না। এক দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে। ঢেউয়ের মাতামাতির মধ্যে সে কিছু লুকোতে চাইছে।

'রানা, অনেক বেলা হয়েছে, বাড়ি চল। এরপর বড়মা চিন্তা করবেন।' কাজল রানার হাত ধরে টেনে তুলল জল থেকে।

বাড়ি ফিরে দুজনে খেতে বসল। সামনে খাবার। অথচ কেউ খেতে পারছে না। গলায় আটকাচ্ছে দুজনেরই। মুখে কোনো কথা নেই কারো। কাজলের চোখ থেকে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ল ভাতে। বড়মা এই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনিও আর সামলাতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি নিজেকে গোপন করতে উঠে গেলেন। তিনি পালিয়ে বাঁচলেন।

পালালো কাজলও। খাওয়ার টেবিল থেকে উঠে গেল একা থাকবার জন্য। রানা হতভম্বের মতো বসে রইল চুপচাপ।

দুপুরে অন্নপূর্ণা জিনিস গোছাচ্ছেন একা। কাজল তাকে সাহায্য করছে। রানার কাছে থাকলে মাঝে মাঝে দুঃখটা এমন মারাত্মক হয়ে উঠছে যে নিজেকে সামলানো যাচ্ছে না। তার চেয়ে এই বেশ। সময় কেটে যাচ্ছে হু-হু করে। এক-একটা জিনিস কাজল অন্নপূর্ণার হাতে এগিয়ে দিচ্ছে আর তার মনে হচ্ছে বড় বাড়িটা যেন তছনছ হয়ে যাচ্ছে অদ্ভুত ভাবে।

রানা একা বারান্দায়। সে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। তার ভেতরে একটা যন্ত্রণা। কিছু ফেলে যাওয়ার, ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা। রানা কাউকে বোঝাতে পারছে না। শুধু বার বার তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। কাজল কখন কাজের ফাঁকে উঠে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে হুঁশ নেই। সে দেখছে কাজলদের বাড়ি মান ভবন।

দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে গেল। গোছগাছ শেষ। পুরীর আকাশ জুড়ে সন্ধ্যে নেমেছে। অন্নপূর্ণা আর রানা অপেক্ষা করছেন গাড়ির জন্য। একটু বাদেই গাড়ি এল। সব মাল তোলা হল। অন্নপূর্ণা দুহাত জোড় করে শেষবারের মতো জগন্নাথকে প্রণাম

করলেন। কাজল মাথা হেঁট করে ওঁকে প্রণাম করল। অন্নপূর্ণার পায়ে পড়ল কাজলের উষ্ণ চোখের জল। তিনি দুহাতে কাজলকে বুকে টেনে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজল কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। দু হাতে অন্নপূর্ণাকে জড়িয়ে ধরে বাচ্চাদের মতো প্রশ্ন করল, 'বড়মা, তোমরা আবার কবে আসবে?'

'আসব রে আসব—' অন্নপূর্ণা হাতের চেটোয় চোখ মুছে নিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন কাজলের এই প্রশ্নের উত্তরে তাকে মিথ্যেই বলতে হবে; কারণ রানা কবে লেখাপড়া শেষ করে ফিরবে, তারপর তারা পুরী আসবেন, এসবই বহুদূর ভবিষ্যতের কথা। তাই তিনি বললেন, 'তুই দেখিস কাজল, খুব শিগগিরই চলে আসব।' কথা শেষ করেই তিনি গাড়িতে উঠে বসলেন।

রানা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। কাজল এবার তার পাশে গেল। রানাকে গাড়িতে উঠতে হবে। সে উঠলেই গাড়ি ছাড়বে। তার হাতে ছোট সুটকেশের মতো গ্রামোফোনটা। কয়েকটা এলোমেলো মুহূর্ত। দুজনে কথা বলল না। কারো মুখেই কোনো কথা এল না। একটা স্তব্ধতা। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিল। এঞ্জিনের যান্ত্রিক শব্দ ওদের নীরবতাকে ভেঙে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার গলা পাওয়া গেল। রানাকে ডাকছেন। 'দেরী হয়ে যাচ্ছে—এই বেলা উঠে আয়।'

রানা উত্তর দিল না। তার চোখে জল। সামনে সব কিছু আবছা। হঠাৎ সে কাজলের একটা হাত খুব দ্রুত টেনে নিয়ে গ্রামোফোনটা ধরিয়ে দিল। কাজলের হাত কাঁপছে। তবু সে শক্ত মুঠিতে ধরল। রানা আর দাঁড়াল না। পিছন ফিরে চলতে চলতে বলল, 'ওটা আজ থেকে তোমার। রেকর্ডগুলো দারোয়ানের কাছে আছে, চেয়ে নিও।' রানা গাড়িতে উঠল। গাড়িটা শব্দ করে আস্তে আস্তে কাজলের চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। যাবার

পরও কাজল তাকিয়ে থাকল। চোখের পাতা পড়ছিল না। একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। গাড়ির চিহ্ন নেই কোথাও। তবু কাজলের চোখ যেন রানাকে দেখছিল। গাড়িটাও দূর থেকে দূরে, কত দূরে চলে যাচ্ছে।

চোখ ঝাপসা হয়ে এল এক সময়ে। পাতা পড়ল চোখের। পাপড়ি ভিজে। কাজল আবার তাকাল সামনে। গ্রামোফোনটা জোর করে আঁকড়ে ধরল বুকে। বুক ফাঁকা করে নিঃশ্বাস পড়ছিল। তারপর আর তাও না। আচমকা কাজল দেখতে পেল, একটা বিশাল ঢেউ আসছে এগিয়ে। নীল ঢেউ। ঢেউটা বড় হচ্ছে। বড় হতে হতে পাহাড়-প্রমাণ হয়ে গেল বুঝি। আর সেই ঢেউয়ের পাহাড় দানবের মতো ছুটে এসে লাফিয়ে পড়ল বাড়ির গায়ে। ঢেউয়ের মধ্যে বাড়িটা ঢাকা পড়ল। তলিয়ে গেল। তারপর নৌকোর মতন ভাসতে ভাসতে সমুদ্রের কাছে চলে যাচ্ছিল। আর কি আশ্চর্য! কাজলের মনে হল—সে ওই নৌকোর মধ্যে। নৌকোটা তাকে নিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছে। নিভে গিয়েছে সমস্ত আলো। অন্ধকারে বসে কাজল অনেক দূরের একটা আলোর বিন্দু দেখতে পাচ্ছে। তারার মতো ওই আলোর বিন্দুও কি নিভে যাবে?

সমাপ্ত